সন্দর্ভ-রত্ন



কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুলের হেড্ পণ্ডিত
এবং কলিকাতা নিউইণ্ডিয়ান স্কুলের
ভূতপূর্ব্ব হেড্ পণ্ডিত
শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু কাব্যরত্ন-
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

প্রকাশক—শ্রীফণিভূষণ মিত্র
ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী, ৫৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বঙ্গাব্দ—১৩৩১

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী,

৫৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ষ্টুডেন্ট্‌স্ লাইব্রেরী,

৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাণী প্রেস,

৩৩এ, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

সন্দর্ভ-রত্নকে যথার্থ রত্নকোষে পরিণত করিতে যত্নের ত্রুটি করি নাই। এই গ্রন্থে প্রাচীন ও নব্য উভয়বিধ গদ্য রচনার একত্র সমাবেশে বাঙ্গালা গদ্যের রীতিক্রম প্রদর্শন করিয়া রচনার রীতিপ্রকৃতির পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-কালে যেমন ভাষা তেমনই বিষয়ের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। তাহাতে ভাষাশিক্ষার সঙ্গে বালকগণ কালোচিত ভাবসম্পদ্ বরণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভে যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিবেন।

প্রবন্ধ-পরিচয়-প্রসঙ্গে প্রবন্ধ-প্রণেতৃগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছি। এই সুযোগে বালকগণ বর্ত্তমান যুগের অনেকগুলি মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ পাইবেন।

বালকগণ একটি অজ্ঞাত বিষয় নিজের চেষ্টায় জানিতে গিয়া সেই সঙ্গে আর দশটি নূতন বিষয় শিখিতে পারেন, এ সুযোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রন্থের অন্তর্গত অল্পজটিল স্থলগুলিরও টীকা এমন কি শব্দার্থ, প্রকৃতি-প্রত্যয় পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়া বালকদিগকে শিশুকাল হইতে একান্ত স্বাবলম্বনহীন করা আমাদিগের অনভিপ্রেত হইলেও প্রচলিত রীতির অনুসরণে নিতান্ত আবশ্যকবোধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা প্রদত্ত হইল। বালকগণ নিতান্ত পঙ্গু না হইলে তদবলম্বনে প্রবন্ধগুলির সম্যক্ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে বিনীত নিবেদন—এই পুস্তকের সঙ্কলনকালে আগ্রহ সত্ত্বেও সমুদায় লেখকের অনুমতিগ্রহণে সুযোগ বা অবকাশ ঘটে নাই। ভরসা করি সেই সকল উদারধী লেখকগণের কেহই তাঁহাদের বিশাল ভাণ্ডারে মুষ্টিভিক্ষুক এই দরিদ্রের প্রতি নিষ্করুণ হইবেন না। ইতি।

পারমধুদীয়া,
খুলনা
৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩১

সঙ্কলয়িতা

সূচী-পত্র

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
আলেখ্য-দর্শন	... ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ...	১
সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য	... অক্ষয়কুমার দত্ত ...	৯
চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশ	তারাশঙ্কর তর্করত্ন ...	১৪
যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ	... কালীপ্রসন্ন সিংহ ...	১৮
ক্রীট দ্বীপ	... রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়...	২৩
মাণিকলাল	... বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়...	২৭
পথি-পার্শ্বে	... বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়...	৩৪
রঘুনাথজী হাবিলদার	... রমেশচন্দ্র দত্ত ...	৩৮
রোগীর সেবা	... ভূদেব মুখোপাধ্যায় ...	৪৩
ভারতের অনার্য্যজাতি	... রজনীকান্ত গুপ্ত ...	৪৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	... রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ...	৫৪
ক্লিফোর্ডের কীট	... রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ...	৬১
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়	... শিবনাথ শাস্ত্রী ...	৬৭
ধর্ম্মের জয়	... শিবনাথ শাস্ত্রী ...	৭৪
সৌভ্রাত্র	... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮০
কাব্যে উপেক্ষিতা	... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৬
রামায়ণের কতিপয় চরিত্র	... রাখালদাস চক্রবর্ত্তী ...	৮৯
বিনয়ের অবতার	... জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ...	৯৭

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র ...	চন্দ্রনাথ বসু ...	১০৩
ভরত-মিলন ...	দীনেশচন্দ্র সেন ...	১১৩
মধুসূদনের কাব্যানুরাগ ও জন্মভূমির সৌন্দর্য্য ...	যোগীন্দ্রনাথ বসু ...	১১৯
পিতৃভক্ত জালিম সিংহ ...	নিখিলনাথ রায় ...	১২৬
উইলবার ফোর্স ...	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ...	১৩১
মহর্ষি মনসুর ...	মোজাম্মেল হক্ ...	১৩৫
ভারতবর্ষ ...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	১৪১
অহঙ্কার ...	কালীবর বসু ...	১৪৪
পরিশ্রম ও প্রতিভা ..	কালীবর বসু ...	১৫৭
অশ্রুজল	কালীপ্রসন্ন ঘোষ ...	১৬২
মা—		
(১) ...	অশ্বিনীকুমার দত্ত ...	১৬৯
(২) ...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	১৭০
(৩) ...	কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	১৭১
(৪) ...	শশাঙ্কমোহন সেন ...	১৭১
(৫) ...	কালীবর বসু ...	১৭২
(৬) ...	মানকুমারী বসু ...	১৭৫
জ্ঞানের সাধনা ...	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ...	১৭৭
সাধারণের উন্নতি ...	অক্ষয়চন্দ্র সরকার ...	১৮১
মানবজীবনে দুঃখ-বিপত্তির উপযোগিতা ...	শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ...	১৮৫
মন্ত্রের সাধন (ব্যোমযান) ...	সার জগদীশচন্দ্র বসু ...	১৯৩
গাছের কথা ...	সার জগদীশচন্দ্র বসু ...	২০০

সন্দর্ভ-রত্ন।

—:০*০:—

আলেখ্য-দর্শন।

[৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।]

[বঙ্গাব্দ ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতার নাম ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : মাতার নাম ৺ভগবতী দেবী।

এ দেশের চিরচলিত প্রথানুসারে পঞ্চম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। নবম বৎসরে তিনি পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া ১২৩৬ সালে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় বিংশ বৎসরে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, অলঙ্কার প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া বিদ্যাসাগর উপাধি-প্রাপ্ত হন। ইঁহার পূর্ব্বে বা পরে অনেকেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই বিদ্যাসাগরের যশোভাতি হরণ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ 'বিদ্যাসাগর' বলিলে বঙ্গবাসী একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকে এবং বোধ হয় চিরকালই বুঝিবে। ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যার সাগর নয়, পরন্তু তিনি শীলের সাগর, তেজের সাগর, সর্ব্বোপরি দয়ার সাগর বলিয়া জনসাধারণের পূজা পাইয়া আসিতে-ছেন। দেশহিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানেই তাঁহার আন্তরিক সহযোগিতা ছিল. কিন্তু পরোপকার ও শিক্ষাপ্রচারই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এজন্য তিনি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, কলেজস্থাপন এবং বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া এম, এ, পর্য্যন্ত যাবতীয়

শ্রেণীর পাঠোপযোগী বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহাকে "গাছে পাড়া, তলায় কুড়ান" বলে, বিদ্যাপ্রচারে বিদ্যাসাগর আমাদের ঠিক তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের সংস্কার বিদ্যাসাগরের এক প্রধান কার্য্য। ইতঃপূর্ব্বে গদ্যসাহিত্যের অবস্থা সাতিশয় হীন ছিল। সন্ধিসমাসাদির জটিলতায় গদ্য-সাহিত্যকানন পাঠকের পক্ষে দুর্গম ও অপ্রীতিকর ছিল। বিদ্যাসাগরের কর-কৌশলে সে জটিলতার কুজ্ঝটিকা অপসারিত হওয়ায় প্রতিভার নবারুণ প্রভায় সাহিত্যকানন অতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে।

মহাকবি ভবভূতির উত্তররামচরিতনামক সুবিখ্যাত নাটকের ছায়াবলম্বনে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সীতার বনবাস' নামে যে মনোহর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহার প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে 'আলেখ্য-দর্শন' প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। বিদ্যাসাগরের রচনার সম্পূর্ণ রসানুভব করিতে হইলে, তৎপ্রণীত সমগ্র 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা'-প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। লক্ষ্মণ সীতার মনোরঞ্জনের জন্য এই চিত্রের অবতারণা করেন। রামসীতার প্রণয়োৎকর্ষবর্ণনা এ প্রস্তাবের অন্যতম উদ্দেশ্য। কবি সুকৌশলে এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।]

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎক্ষণ, ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ, বেদরক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। গুরুপরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র লাভ করেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি সবিশেষকৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাড়কানিধনকালে আমায় তৎসমুদায় প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি উহারা আমার অধিকারে আছে; তোমার পুত্র হইলে তাহাদিগকেও আশ্রয় করিবে।

লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! এদিকে মিথিলাবৃত্তান্ত অবলোকন করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, তাই ত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন; আর পিতা আমার, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অনিমিষ নয়নে ইহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি, মরি! চিত্রকর কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে! আবার এদিকে বিবাহকালীন সভা; সে সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছ! চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই স্থানে সেই সময়ে আমরা বিদ্যমান রহিয়াছি। সীতার এই সমস্ত কথা শুনিয়া, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম কহিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেন ঠিক সেই সময়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, লক্ষ্মণ কহিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ ঊর্ম্মিলার নাম উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ, কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরাসনভঙ্গবার্ত্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন আমাদিগের অযোধ্যাগমনপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। আবার এদিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য, তাঁহার দর্প সংহার করিবার নিমিত্ত, শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদশ্রবণে নিরতিশয় লজ্জিত হইতেন; এজন্য তিনি কহিলেন, লক্ষ্মণ, এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় সত্ত্বেও ঐ অংশ লইয়া তুমি আন্দোলন করিতেছ

কেন? সীতা রামবাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নাথ! এমন না হইলে, সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবে কেন?

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্‌গদবচনে কহিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল, পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ, মাতৃদেবীগণ অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, সতত তাহাদের প্রতি তাঁহারা কতই যত্ন, কতই মমতা প্রদর্শন করিতেন; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ ছিল। হায়! সে সকল কি আহ্লাদ ও কি উৎসবের দিনই গিয়াছে! লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই মন্থরা! রাম মন্থরার নামশ্রবণে অন্তঃকরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, কোন উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবেরনগরে যে তাপসতরুতলে পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত রহিয়াছে!

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! এদিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ বৃত্তান্ত দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ইক্ষাকুবংশীয় রাজগণ পুত্রহস্তে বৃদ্ধবয়সে রাজ্যলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া অরণ্য-বাস আশ্রয় করেন; কিন্তু আর্য্যকে বাল্যকালেই সেই কঠোর আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর লক্ষ্মণ রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ আমাদিগকে চিত্রকূট যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া যাহার কথা কহিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্ত্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা কহিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা স্মরণ হয়? রাম উত্তর করিলেন, অয়ি প্রিয়ে! কেমন করিয়া ইহা ভুলিয়া

যাইব? এই স্থলে তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া নিদ্রিতা হইয়াছিলে।

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপরি ধারণ করিয়া আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন! গৃহস্থগণ বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখ-সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি, এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মনে হয়, এই স্থানে আমরা কেমন মনের সুখে ছিলাম! আমরা কুটীরে থাকিতাম, লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফলমূলাদি আহরণ করিতেন, গোদাবরীতীরে মৃদুমন্দগমনে ভ্রমণ করিয়া প্রাহ্নে ও অপরাহ্নে শীতল সুগন্ধ সমীরণ সেবা করিতাম। হায়! সেরূপ অবস্থায় থাকিয়া, কেমন সুখে আমরা সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, ইহা ভাবিয়া ম্লানমুখে কহিলেন, হা নাথ! এই

পর্য্যন্ত দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অয়ি, বিয়োগকাতরে! ইহা চিত্রপট বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই চিত্রদর্শনে জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ বোধ হইতেছে। দুরাচার নিশাচরেরা হেমময়মৃগচ্ছলে যে অতি বিষম অনর্থ সংঘটন করিয়াছিল, যদিও সমুচিত বৈরনির্য্যাতন দ্বারা তাহার সম্পূর্ণরূপ প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি ইহা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলেই মর্ম্মবেদনা প্রদান করে। সেই ঘটনার পর, আর্য্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থানভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকন করিলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা লক্ষ্মণমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্য আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে রামেরও নয়ন-যুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া আপনিও এত অভিভূত হইলেন কেন? রাম কহিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্য্যাতনসংকল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছ, তবে এখন অনভিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ কেন?

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন, এবং বিষয়ান্তর-সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তরসম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এদিকে দণ্ডকারণ্যভূভাগ অবলোকন করুন;

এই স্থানে দুৰ্দ্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল, এদিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রম; এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা; এদিকে এই পম্পা সরোবর। রাম পম্পাশব্দশ্রবণে সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর। আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল মন্দমারুতভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে! তাহাদের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে; মধুকরগণ মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংসসারসপ্রভৃতি বারি-বিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল; অতএব সরোবরের শোভা সম্যক্ অবলোকন করিতে পারি নাই। এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম তাহাতেই আমি একবারমাত্র অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।

সীতা চিত্রপটের এক অংশে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্বতরুশাখায় মদমত্ত ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে করিতে উহাঁকে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্; মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধর-সংযোগে ইহার শিখরদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। রাম ইহা শুনিবামাত্র পূর্ব্ব অবস্থা তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে তিনি একান্ত আকুলহৃদয়

হইয়া কহিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও; তুমি আর মাল্যবানের উল্লেখ করিও না। ইহা শুনিয়াই আমার শোকসাগর অনিবার্য্যবেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে! জানকীর বিরহ পুনর্ব্বার নবীন ভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্যলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই, আর্য্যা জানকীর ক্লান্তি বোধ হইতেছে; এক্ষণে উহাঁর বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য।

[৺অক্ষয়কুমার দত্ত।]

[অক্ষয়কুমার ১২২৭ সালে ১লা শ্রাবণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত ও মাতার নাম দয়াময়ী। ইহাঁরা উভয়েই বিবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন।

মানুষ সামান্য অবস্থা হইতে স্বাবলম্বনবলে যে কতদূর কৃতী হইতে পারেন, অক্ষয়কুমার নিজ জীবনে তাহার উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি দারিদ্র্য, রোগদৌর্ব্বল্য এবং পাঠশালালব্ধ অতি সামান্য শিক্ষা সম্বল করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অনন্তর আত্মচেষ্টাবলে বাঙ্গালা, ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান্‌প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বহুবিধ জ্ঞানরত্নের অধিকারী হইয়া যে বিপুলায়ত বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবাসী চিরদিন তাহা মুগ্ধ নেত্রে অবলোকন করিবে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার উভয়ের ভাষার প্রকৃতি এক, পরন্তু অক্ষয়কুমারের ভাষা সাগরের ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের লেখনী নীতি ধর্ম্ম জ্যোতিষ বিজ্ঞানপ্রভৃতি বিবিধবিষয়িণী প্রবন্ধ-রচনায় তৎকালে অগ্রণী এবং সর্ব্বকালে একরূপ অগ্রগামিনী একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

অক্ষয়কুমার ১২৯৩ সালে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি 'পদার্থ-বিদ্যা,' 'ধর্ম্মনীতি,' 'চারুপাঠ' ৩ ভাগ, 'বাহ্য-বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' ২ভাগ, 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' ২ ভাগ, প্রভৃতি মূল্যবান্ গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা আবেগময়ী, উচ্ছলগতি। উক্ত প্রবন্ধ তাঁহার চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ হইতে গৃহীত।]

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানবজাতি

পশুজাতি অপেক্ষা যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখ, ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লা যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেমন প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্ন সুচারু চিত্তপ্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নিবৃত্ত থাকিয়া, নিকৃষ্ট সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়; সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানজনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ উপভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

অশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ আবাল্যবার্দ্ধক্য প্রায় অধম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। তাহাকে উদরান্ন আহরণার্থ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-পরিচালনপূর্ব্বক শারীরিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কিন্তু তাহার প্রধান মনোবৃত্তিসমুদায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া অথবা অযথাবিধানে পরিচালিত হইয়া অকর্ম্মণ্য ও দোষান্বিত হইতে থাকে। জীবিকা-সংক্রান্ত কার্য্যই তাহার পক্ষে প্রধান কার্য্য এবং প্রায়ই বর্ত্তমান কাল ও সন্নিহিত বিষয়মাত্র তাহার আলোচনার বিষয়। এরূপ ব্যক্তি স্বদেশব্যতিরিক্ত সর্ব্ব দেশের সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ; হয়ত, অবনিমণ্ডলকেই অসীম বলিয়া বিশ্বাস করে। পৃথিবীর আকৃতি কি প্রকার ও আয়তন কত, তাহার জলস্থলের অবস্থাই বা কীদৃশ, তাহার অন্তঃপাতী কোন্ দেশের কিরূপ শোভা, কোন্ দেশে কিরূপ লোকের অধিবাস, তাহাদের আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিই বা কি প্রকার, নদ, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবর, দ্বীপ, প্রায়দ্বীপাদির অবস্থাই বা

কিরূপ এবং কিয়দ্‌গুণাবলম্বী, কত প্রকার ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণীতেই বা পরিপূর্ণ এ সকল বিষয়ে সে ব্যক্তি বনচারী সিংহ ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ নহে। মানবসমাজ কীদৃশ সামাজিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে, পূর্ব্বাবধি পৃথিবীতে সংগ্রাম-সংঘটন, ধর্ম্মপরিবর্ত্তন, রাজ্যবিপ্লবসংঘটন প্রভৃতি কত মহানর্থকর ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, এবং মানবজাতি বিজ্ঞান ও শিল্প-কার্য্যের কিরূপ উন্নতি সম্পাদন করিয়া উত্তরোত্তর অলক্ষিতপূর্ব্ব অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধিসোপানে আরোহণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার কিছুই অবগত নহে; সে স্বকীয় নিবাসভূমি ভূমণ্ডলের বিষয়ে যেমন অজ্ঞ, অপরিসীম গগনমণ্ডলের বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক। সুশিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিয়া পরম পবিত্র সুখার্দ্রহৃদয়ে যেরূপ পরমাদ্ভুত পরিশুদ্ধ জ্ঞানারণ্যে বিচরণ করেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি স্বপ্নেও একবার তথায় পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় না। সে ব্যক্তি বিদ্যামন্দিরের দ্বারস্বরূপ ব্যাকরণবিদ্যাকেই যথার্থ বিদ্যা বোধ করে; জন্মপত্রিকারচনা ও শুভাশুভ দিনক্ষণগণনাকেই প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ্যা বলিয়া প্রত্যয় করে।

করুণাময় পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্যপরিপালনার্থ যে সকল মঙ্গলময় নিয়ম সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি সে সমুদায় অবগত নহে। তাহার অজ্ঞানাবৃত অন্তঃকরণ সর্ব্বস্থানেই নানা বিভীষিকা কল্পনা করে। ভূতপ্রেতপিশাচপ্রভৃতি অবাস্তবিক পদার্থ তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করে। যাহার অন্তঃকরণ ঘোরতর অজ্ঞানতিমিরে এরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জ্ঞানোৎপাদ্য পরমাদ্ভুত বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগে তাহার অধিকার হইবার বিষয় কি?

সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তির প্রশস্ত হৃদয় পরম পরিশুদ্ধ বিদ্যা-

লোক লাভ করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইয়া থাকে! তাঁহার অন্তঃকরণ অকারণে অলীক শঙ্কায় শঙ্কিত বা সঙ্কুচিত হইবার নহে। অকারণ উৎকণ্ঠা, অমূলক আশঙ্কা, তাঁহার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারে না। প্রসাদরূপ পবিত্র সমীরণ তাঁহার চিত্তে সতত সঞ্চরণ করিতে থাকে।

এতাদৃশ বিদ্যালোকসম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসঙ্খ্য বিষয়ের অসঙ্খ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধনেত্রের গোচর থাকে, তাহা জানিয়া দেখিলে, বোধ হয়, তিনি নরলোকনিবাসী হইয়াও, কোন চমৎকারময় সুচারু স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথসময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইয়া থাকে; সে সময়ে তিনি নিভৃতস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গগনমণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজন করিয়া, অসীম বিশ্বব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমারা যে প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা অপরিসীম আকাশমার্গে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া এবং তিনি বাসনাবর্ত্মে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুরভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিয়া, অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন।

তিনি কখনও বা গগনমণ্ডলস্থ ভূরিসংখ্য বৃহদাকার পদার্থ-দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া, সূক্ষ্মপদার্থপর্য্যবেক্ষণবাসনায় ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে পারেন, এবং অণুবীক্ষণপ্রদর্শিত অসংখ্যরূপ অতি সূক্ষ্ম বস্তুর অশেষবিধ শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে পারেন। এরূপ সৌভাগ্যশালী বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জীবের শরীরে ও বৃক্ষের পল্লবে যেরূপ শোভা, যেরূপ শিক্ষা ও যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করেন, অণু-

বীক্ষণের সৃষ্টি না হইলে, তাহা মানবজাতির দৃষ্টিপথে কদাপি আবির্ভূত হইত না। যে ব্যক্তি উক্ত যন্ত্রসহকারে সে সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। অশিক্ষিত ব্যক্তি যে স্থান জীবশূন্য অকর্ম্মণ্য বোধ করে, শিক্ষিত ব্যক্তি সে স্থান জ্ঞান ও ক্রীড়া, রাগ ও বাসনা, সুখ ও সন্তোষের আধার বলিয়া প্রতীতি করেন, এবং প্রত্যেক অণুপ্রমাণ স্থান পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় কীর্ত্তিতে পরিপূরিত দেখিয়া, ভক্তিসহকৃত পরমানন্দরসে অভিষিক্ত হন।

যে মহাত্মার অন্তঃকরণমধ্যে এতাদৃশ মনোহর সুখ বিচরণ করে, সেই মহাত্মার সুখ, কোন অশিক্ষিত ব্যক্তির সুখাপেক্ষা অশেষগুণে উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি মার্জ্জিত-বুদ্ধিপরিচালনে সে সুখোদয় হয়, যদি ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং সুন্দর ও মহৎ অশেষবিধ পদার্থচিন্তনে সুখ-সঞ্চার হয় এবং যদি মহিমার্ণব পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ও অপার মহিমার অসংখ্য নিদর্শনদর্শনে প্রগাঢ় সুখের উদ্ভব হয়, তবে জ্ঞানালোকসম্পন্ন বিশুদ্ধচিত্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পরমোৎকৃষ্ট নিরুপম সুখের উপমা দিবার আর স্থল নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

চন্দ্রাপীড়ের প্রতি শুকনাসের উপদেশ।

[৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন।]

মহাকবি বাণভট্টপ্রণীত কাদম্বরী একখানি মনোহর সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ। চন্দ্রাপীড় এই গ্রন্থের নায়ক। চন্দ্রাপীড়ের পিতা রাজা তারাপীড়ের শুকনাস নামে অতি বিচক্ষণ এক মন্ত্রী ছিলেন। চন্দ্রাপীড়ের প্রতি অমাত্য শুকনাসের উপদেশসমূহ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ। পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন সাতিশয় নিপুণতার সহিত উক্ত কাদম্বরীর গল্পাংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া 'কাদম্বরী" নামে অতি সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার ভাষা 'সাগরী' ভাষার অনুরূপ। কিন্তু স্থলবিশেষে কিছু কিছু আড়ম্বর-বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী হইতে গৃহীত হইল।]

একদা কার্য্যক্রমে চন্দ্রাপীড় অমাত্যের বাটীতে গিয়াছিলেন। তথায় শুকনাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, "কুমার! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদায় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, সকল কলা শিখিয়াছ, ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য সমুদায় জানিয়াছ। তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশ করিলে বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভপ্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবন-প্রভাবে মনে এক প্রকার তম উপস্থিত হয়, উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায়

কলুষিতা হয়। বিষয়তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই প্রভুত্বপ্রভাবের তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহিকা শক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ স্ফটিকমণিতে যেরূপ, মৃৎপিণ্ডে কি সেইরূপ প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন, উহা শরীরে জরা প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয়, এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরি-গুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ লোকের মুখে প্রভু-

বাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয় এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময়ে বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতি দুঃখে লব্ধ ও অতি যত্নে রক্ষিত হইলেও কখন একস্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেন না। রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য পুরুষাধমের আশ্রয় লন। কষ্টলভ্য লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করেন, সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। যে যে স্থানে এই চপলা দীপ্তি প্রাপ্ত হন; সেখানেই সকলকে দীপশিখার ন্যায় কজ্জলমলিন করিয়া দিয়া আসেন। দুরবগাহ নীতিপ্রয়োগ ও দুর্ব্বোধ রাজ্যতন্ত্রের ভার গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ; সাবধান! যেন সাধুদিগের উপহাসাস্পদ ও চাটুকারের প্রতারণাস্পদ হইও না। চাটুকারের প্রিয় বচনে তোমার যেন ভ্রান্তি না জন্মে। যথার্থবাদীকে নিন্দক বলিয়া যেন অবজ্ঞা করিও না। রাজারা আপন চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না এবং এরূপ হতভাগ্য লোকদ্বারা পরিবৃত থাকেন, যাহাদের প্রতারণা করাই সম্পূর্ণ

ইচ্ছা। বাহ্যভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আপনাদিগের দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটুবচনে প্রভুকে প্রতারিত করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীর, তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি; সাবধান! যেন ধন ও যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূভার বহন কর, অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কর এবং সমুদয় দেশ জয় করিয়া অখণ্ডভূমণ্ডলে আপন আধিপত্যস্থাপনপূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রতিপালন কর"। এইরূপ উপদেশ দিয়া অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাসের গভীর অর্থযুক্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

[৺কালীপ্রসন্ন সিংহ]

[কলিকাতা—জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদারবংশে সিংহ মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী এই তিনটি ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

কালীপ্রসন্নের অতুল কীর্ত্তি—ব্যাসরচিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ। ইনি তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ প্রায় যাবতীয় পণ্ডিতের সাহায্যে বিপুল ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারতের বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রচার করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করেন।

এতদ্ভিন্ন কালীপ্রসন্ন "হুতোম পেঁচার নক্সা" নামে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হুতোমের নক্সায় তৎকালীন কলিকাতার নিখুঁৎ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত প্রবন্ধটি—কালীপ্রসন্নের প্রচারিত মহাভারত হইতে সঙ্কলিত।

যুধিষ্ঠির পত্নী দ্রৌপদী এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল. সহদেব এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত স্বর্গগমনাভিলাষে হিমালয়াভিমুখে মহাপ্রস্থান করেন। পথিমধ্যে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পত্নী ও ভ্রাতৃগণের দেহত্যাগ হয়। কুক্কুররূপী ধর্ম্ম তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।]

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর।" তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের পতননিবন্ধন শোকাকুল হইয়া দেবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সুররাজ! সুখসংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ

করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে অনুজ্ঞা করুন।”

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃচতুষ্টয় মানুষ-দেহপরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।”

সুররাজ এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলে, ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন. “দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার হইবে।”

ধর্ম্মরাজ এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “আজ তুমি অতুল সম্পদ্, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে; অতএব অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।”

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, “দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমাকে এই পরমভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।”

ইন্দ্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, সে কখনই স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয় না। ক্রোধবশ-নামক দেবগণ তাহার যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অতএব, তুমি অবিলম্বে এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর। ইহাতে তোমার কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবেন্দ্র! ভক্তজনকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়; অতএব আমি আত্ম-সুখের নিমিত্ত কখনই এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।"

ইন্দ্র কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! কুক্কুর যজ্ঞ, দান ও হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশনামক দেবগণ ঐ সমুদায় কার্য্যের ফল ধ্বংস করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু; অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার পরম পবিত্র দেবলোক লাভ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গলাভে অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক্ষণে এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দেবরাজ! ইহলোকে কাহারও মৃতব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, আমি উহাদের জীবনদান করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই, উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। আমার মতে ভক্তজনকে পরিত্যাগ করা শরণাগত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন,

স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ এই চারিটি কার্য্যের ন্যায় মহাপাপ-জনক।”

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সেই কুক্কুর সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুক্কুর-বেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বভূতে দয়াশীল। পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জল-অন্বেষনার্থ গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে স্মরণপূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে; এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্যদর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহ নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণপূর্ব্বক অক্ষয় লোক লাভ করিতে পারিবে।”

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিবামাত্র ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্‌গণ এবং অন্যান্য দেবতা ও দেবর্ষিসমুদয় তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিব্যরথে আরোপিত করিয়া, আপনারা দিব্য বিমানসমুদয়ে সমারূঢ় হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ সেই দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক তেজোদ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইবামাত্র লোকতত্ত্ববেত্তা তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ দেবগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, “যে সমুদয় রাজর্ষি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আজি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় যশঃ ও তেজো-দ্বারা তাঁহাদিগের সকলেরই কীর্ত্তি আচ্ছাদনপূর্ব্বক সশরীরে স্বর্গারূঢ়

হইলেন। পূর্ব্বে আর কোন ব্যক্তিই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

দেবর্ষি এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির দেবগণ ও স্বপক্ষীয় পার্থিবগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাপুরুষগণ। আমার ভ্রাতৃগণ যে লোকে গমন করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক, আমি সেই লোকেই গমন করিব। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকে অবস্থান করিতে আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই।" ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সরলভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিয়াছ, অতএব এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন তুমি অদ্যাপি মনুষ্যবৎ স্নেহের বশীভুত হইতেছ? আর কেহই কখনও তোমার তুল্য সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন নাই। তোমার ভ্রাতৃগণ এ স্থানের অধিকারী নহেন। এই স্বর্গভূমিতে সমুপস্থিত হইয়া মানুষভাবে সমাক্রান্ত হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত। এই দেখ, মহর্ষি ও দেবগণ এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন।"

দেবরাজ এই কথা কহিলে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সুররাজ! আমার প্রণয়িনী বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী ও পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ যে স্থানে বাস করিতেছে, সেই স্থানেই গমন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।"

ক্রীট দ্বীপ।

[৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

[রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইংরাজী 'টেলিমেকস্' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া 'টেলিমেকস্' নামক অতি সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাঁর রচনায় 'সাগরী' ভাষার অনুপম জ্যোতিঃ লক্ষিত হয়—মধ্যে মধ্যে কঠিন শব্দ সন্নিবিষ্ট হইলেও রচনা মাধুর্য্যগুণবর্জ্জিত হয় নাই। উক্ত প্রবন্ধটি এই শেষোক্ত 'টেলিমেকস্' হইতে গৃহীত।]

টেলিমেকসের ঘটনা-বিবৃতি।

ইথাকার রাজা ইউলিসিসের ট্রোজান যুদ্ধে গমনকালে তাঁহার পুত্র টেলিমেকস্ শিশু ছিলেন। রাজা উক্ত যুদ্ধে দশবৎসরকাল ব্যাপৃত ছিলেন, এবং বাড়ী ফিরিবার কালে পথ ভুলিয়া তাঁহার আরও দশ বৎসর পথে পথে অতিবাহিত হয়। এদিকে পিতৃভক্ত টেলিমেকস্ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতার সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা করেন। অনেক অনুসন্ধানেও পিতার কোন সংবাদ না পাইয়া সমুদ্রসন্নিহিত বিবিধ স্থানের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করিয়া গৃহে আগমন করেন, এবং আসিয়া দেখেন তাঁহার পিতাও প্রত্যাগত হইয়াছেন।]

গগনলম্বী জলদমণ্ডলের ও সাগরগর্ভোত্থ উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া ক্রীট দ্বীপের পর্ব্বতশ্রেণী অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। যেমন যূথমধ্যে বৃদ্ধ মৃগেরই বিশাল বিষাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্রত্য গিরিসমূহমধ্যে আইডা পর্ব্বতের উন্নত শিখর অনতিবিলম্বেই লক্ষিত হইল। ক্রীট দ্বীপ পরম রমণীয় স্থান, দর্শনমাত্র রঙ্গভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ক্রমে ক্রমে উহার উপকূলদেশ সুস্পষ্ট অবলোকিত হইতে লাগিল। সাইপ্রস দ্বীপের ভূমি যেমন অকৃষ্ট ও শস্যাদিশূন্য,

ক্রীট দ্বীপের ভূমি সেরূপ নহে ; উহা প্রজাগণের শ্রমবলে অত্যন্ত উর্ব্বরা, বিবিধ শস্যে ও অশেষবিধ পুষ্পফলে অলঙ্কৃতা।

অল্পকাল পরেই ভূরি ভূরি পরম রমণীয় গ্রাম ও মহাসমৃদ্ধ নগর সকল আমাদিগের নয়নগোচর হইল। সেখানে এমন ক্ষেত্রই দৃষ্ট হইল না যে, উহা কৃষীবলগণের শ্রমসূচক চিহ্নে অঙ্কিত নহে ; একটি কণ্টক-বৃক্ষ বা তৃণ লক্ষিত হইল না! ঐ দ্বীপের মনোহর শোভাসন্দর্শনে আমাদিগের অন্তঃকরণে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল! দেখিলাম, উপত্যকাপ্রদেশে বহুসংখ্যক পশুযূথ চরিয়া বেড়াইতেছে ; ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীগণ নিরন্তর প্রবলবেগে প্রবহমাণ হইতেছে ; মেষগণ পর্ব্বতের উৎসঙ্গদেশে স্বচ্ছন্দে শষ্প ভক্ষণ করিতেছে ; ক্ষেত্রসকল অশেষবিধ শস্যে সুশোভিত ও পরিপূরিত রহিয়াছে ; ফলভরনমিত দ্রাক্ষালতা স্নিগ্ধ হরিৎ পল্লবদ্বারা পর্ব্বতগণের অনুপম শোভা সম্পাদন করিতেছে।

এই দ্বীপ শতসংখ্যক মহানগরে অলঙ্কৃত ; ইহা এমন সুন্দর যে, বিদেশীয় লোক দেখিবামাত্র ভূয়সী প্রশংসা করে। অত্রত্য অসংখ্য নিবাসীদিগের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী এই দ্বীপেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যাহারা যেরূপ পরিশ্রম-সহকারে ভূমি কর্ষণ করে, বসুন্ধরাদেবী প্রসন্না হইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করেন। যে দেশে যত অধিক লোক, সে সকল লোক অলস না হইলে, তথায় ততই সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় এবং পরস্পর অসূয়া বা বিদ্বেষপ্রদর্শনের অবকাশ বা আবশ্যকতা থাকে না। ভূতধাত্রী বসুন্ধরা, স্বীয় সন্তানদিগকে অকাতরে পরিশ্রম করিতে দেখিলে, প্রসন্না হইয়া তাহাদিগের সংখ্যানুসারে শস্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকেন। দুরাকাঙ্ক্ষা ও অপরিমিত তৃষ্ণাই মানবজাতির দুঃখ-

সমূহের একমাত্র কারণ। প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যান্য লোকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিলাষ করে এবং এইরূপে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পত্তির অধিকারবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থক মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়। যদি মানবগণ স্ব স্ব আবশ্যক বিষয়মাত্রলাভে সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সমৃদ্ধি, প্রণয় ও শান্তি সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইয়া উঠে।

এই সমস্ত বিষয়ে মাইনসের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল বলিয়াই, তাঁহার এতাদৃশী খ্যাতি পৃথ্বীতলে জাগরূক রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত নরপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, মাইনস তৎসর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, আর যত ব্যবস্থাপক আবির্ভূত হইয়াছেন, তৎসর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও প্রবীণ। এই দ্বীপে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা কেবল তাঁহারই ব্যবস্থার মহিমা। তিনি বালকদিগের বিদ্যোপার্জ্জনের যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা শরীর নীরোগ ও বলবীর্য্য-সম্পন্ন হয়, এবং বাল্যকাল হইতেই মিতব্যয়িতা ও পরিশ্রমের অভ্যাস জন্মিতে থাকে। প্রশংসনীয় অশেষ গুণরত্নে অলঙ্কৃত বলিয়া মানব-মণ্ডলীতে খ্যাতি লাভ করিলে যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কোনও সুখই তাহারা অভিলষণীয় জ্ঞান করে না; রণস্থলে মৃত্যুভয়ে অভিভূত না হওয়াই যে সাহসের প্রকৃত কার্য্য এমন নহে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ঐশ্বর্য্যে অশ্রদ্ধা এবং লজ্জাকর সুখ-সম্ভোগে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও সাহসের প্রকৃত কার্য্য। কৃতঘ্নতা, ও অর্থগৃধ্নুতা অন্যান্য স্থানে অসৎ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না, কিন্তু ক্রীট দ্বীপে তৎসমুদায় উৎকট পাপ-রূপে পরিগণিত ও সেই সেই উৎকট পাপের যথোচিত দণ্ড হইয়া থাকে।

সকলে মনে করিতে পারেন যে, ক্রীট দ্বীপে ঐকান্তিকী বিষয়সুখাসক্তি ও ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনের প্রতিষেধক কোনও নিয়ম অবশ্যই আছে; কিন্তু

ক্রীটবাসীরা ঐ দুই পাপের অস্তিত্বই অবগত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমুচিত পরিশ্রম করে, কিন্তু কেহই ধনী হইবার চিন্তামাত্র করে না। স্বচ্ছন্দে ও সুপ্রণালীতে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ, ও জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর নির্ব্বিঘ্নে ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ হইলেই তাহারা স্ব স্ব পরিশ্রম সার্থক বোধ করে। সুরম্য হর্ম্ম্য, মহামূল্য গৃহোপকরণ, সৌষ্ঠবসম্পন্ন বহুমূল্য পরিচ্ছদ, ও বৈষয়িকসুখসংঘটিত উৎসবক্রিয়া তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ। তাহাদের পরিচ্ছদ অত্যুৎকৃষ্ট উর্ণাতে প্রস্তুত ও অতিমনোরম বর্ণে রঞ্জিত বটে, কিন্তু উহা সুবর্ণসূত্রে চিত্রিত বা অন্য কোনও প্রকারে অলঙ্কৃত নহে। তাহাদের আহারসামগ্রী সামান্য ফল, মূল, দুগ্ধ ও গোধূমপিষ্টকের অতিরিক্ত নহে। যদি কখনও তাহাদের মাংসভক্ষণে অভিলাষ হয়, অপ্রয়োজনীয় পশুর মাংস অতি সামান্যরূপে প্রস্তুত করিয়া অল্প পরিমাণে আহার করে। পরিশ্রমক্ষম দৃঢ়কায় পশুসকল শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিয়োজিত থাকে। তাহাদের গৃহগুলি প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, ও সর্ব্বাংশে বাসোপযোগী, কিন্তু চিত্রিত বা অন্য কোনও প্রকারে অলঙ্কৃত নহে। তাহারা গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ, কিন্তু কেবল দেবায়তননির্ম্মাণেই নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাহাদের মতে মনুষ্যের অট্টালিকায় বাস করা কেবল অহঙ্কার ও ধৃষ্টতাপ্রদর্শনমাত্র। স্বাস্থ্য, বীর্য্য, পরাক্রম, নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিরোধে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ, সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতা, আবশ্যক বিষয়ের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অধিকার, অনাবশ্যক ও অনুপযোগী বিষয়ে অবজ্ঞাপ্রদর্শন, পরিশ্রমশীলতা, আলস্যে দ্বেষ, ধর্ম্মানুষ্ঠানে জিগীষা, সর্ব্ব প্রযত্নে বিধিপ্রতিপালন, ও দেবভক্তি, এই সমুদায় ক্রীটবাসীদের ঐশ্বর্য্য, অন্যবিধ ঐশ্বর্য্যে তাহাদের যত্ন ও আদর নাই।

মাণিকলাল।

[৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।]

[১২৪৫ বঙ্গাব্দে ২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৩০০ বঙ্গাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্গসাহিত্যাকাশে শরতের পূর্ণ চন্দ্র। ইঁহার অমৃতময়ী লেখনী অজস্র চন্দ্রিকা বর্ষণ করিয়া সাহিত্যাকাশে অপূর্ব্ব শ্রী দান করিয়াছে। বঙ্কিম এক আধারে কবি, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক প্রত্নতত্ত্বিক ও সুদক্ষ সমালোচক ছিলেন। ইহার অমৃতময়ী লেখনী উপন্যাসের ভিতর দিয়া সংসারপ্রীতি ও স্বদেশভক্তির বন্যা আনিয়া বাঙ্গালীর জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। এই যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার মহিমায় এবং মহীয়সী সাধনার বলে 'আলালী' ও 'সাগরী' ভাষার মিলনে ভাষা প্রাণময়ী ও শক্তিময়ী হইয়া এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী গৌরবময় সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কি শুভক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় 'বঙ্গদর্শন' এর আবির্ভাব !—যেন বঙ্গসাহিত্য-কাননে নব বসন্তের উদয়। কত পিক গাহিল ! কত ফুল ফুটিল ! বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি অনেকগুলি রসমধুর উপন্যাস, 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত' গভীর তত্ত্বপূর্ণগ্রন্থ, 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি হাস্যরসের উৎস বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—"বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অতি চমৎকার। এই লেখা কেবল শ্রুতিমোহকর নহে, কেবল মধুপরিপূর্ণ নহে, ইহাতে তড়িত্তেজ প্রভূত পরিমাণে বহিতেছে। ইহা ভাববৈভবেও অতি ঐশ্বর্য্যময়ী। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নহেন, ইংরাজী বিদ্যাতেও অতি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার নিজের কল্পনাশক্তিও অতি বলবতী। অতএব তিনি এক দিক্ হইতে যেমন

সংস্কৃত সাহিত্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইতে যত্ন করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিক্ হইতে আশ্চর্য্য শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যেমন মাধুর্য্যময়ী, তেমনি শক্তিসম্পন্না ও ভাবপরিপূর্ণা। তিনি বঙ্গভাষায় একরূপ নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। যেদিন বঙ্কিম বাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করিলেন, সেদিন বঙ্গভাষানদীতে উন্নতির কোটালে মহা-বিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল। উন্নতির স্রোত তর তর বেগে ছুটিতে লাগিল। নদীর জল ক্রমশঃ স্ফীত হইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া ভাবুকের মন আনন্দরসে গলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু হইতেই বঙ্গবাসী সখ্ করিয়া বাঙ্গালা বই পড়িতে শিখিয়াছে।"

'মাণিকলাল' প্রবন্ধটি তাঁহার 'রাজসিংহ' নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিলেন চারিজনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে তাহা তিনি দেখেন নাই, তখন তিনি পৌঁছেন নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, উহারা কোন পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ফিরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিলেন, পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বিজয়! এখানে থাকিও, আমি আসিতেছি, কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পাদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন।

অশ্বারোহী দ্রুতবেগে মিশ্র ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারিজনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না, পথের আলাপ; তাহারা বলে "আমরা বণিক্।" এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা, কয়টি আসরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন দিকে গেল, আমি দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারিজন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিল—"দেখিতেছ না, আমি রাজপুত সৈনিক?"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি ও পিস্তল, এবং হস্তে বর্শা। তিনি ভয়ে আর কথা কহিলেন না।

রাজপুত, যে পথে দস্যুদিগকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, অথবা দস্যুদিগের কোন নিদর্শন পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে চারিজনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন, কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর আর উহাদের দেখা গেল না। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে,—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না, নয়, ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত, বৃক্ষাদিচিহ্নদ্বারা সেই স্থানে যাইবার পথ বিলক্ষণ করিয়া নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই

সকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পূর্ব্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা হইতেছে শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারিজন—তিনি একা, এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কি না। যদি গুহাদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারিজনে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ কথা রাজপুতের মনে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কার্য্য হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে পবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্য মরিবে। যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়? তবে নিরপরাধের হত্যা হইবে!

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি-গণের কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অসি নিষ্কোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন। বাম হস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা তখন চঞ্চলকুমারীর পত্র পাইয়া অর্থলোভের আকাঙ্ক্ষায় বিমুগ্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময়ে অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়াছিল। প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে

এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়াছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুই জনের উপর দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে প্রহার করিবার জন্য পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিকলাল, বেগতিক দেখিয়া, গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা বন-মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বাম হস্তে ধরিতাম। কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই কথা বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন। দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া মাণিকলালের চুল ধরিলেন, এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! আমার জীবন দান করুন—আমি শরণাগত।"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল; "আমি মরিতে ভীত নহি।" কিন্তু আমার একটি সাত বছরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই —কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে। আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোন প্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘু দণ্ডেরই বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখেই শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া অবলীলাক্রমে আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিল, অস্থি কাটিল না। তখন মাণিকলাল এক শিলা-খণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া আর একখণ্ড প্রস্তর দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।" রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুত-কুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, এক্ষণে তুমি আমার অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে,—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও, তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তা-বলয়, পত্র দুইখানি, এবং আসরফি চারি ভাগ আনিয়া দিল। বলিল,—"ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনারই জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোণামা। বলিলেন, "মাণিকলাল—পত্র পড়িবার এস্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস,—তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে, একবারও তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না—বা তৎ-

সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই ঘন বন হইতে একটি ক্ষীণা তটিনীতীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পথি-পার্শ্বে

[এই অংশ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' হইতে গৃহীত। অংশটি যেন একখানি নিখুৎ ছবি! অংশটি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে,—নিপুণ লেখক কলমের মুখে সুন্দর ছবি তুলিতে পারেন।]

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু পিছল হইয়াছে। পথে লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথে চলে? একজনমাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারিবেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষমালা—কপালে চন্দনরেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক কতক শ্বেত বর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস। ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ কোথায় অপথ কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না—তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার আলো কুপথ সুপথ সব সমান।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে; সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী পথিমধ্যে অকস্মাৎ এই শব্দ-সূচক দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি—আবার মুহূর্ত্তজন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক।"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটীকে দুই হস্তদ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র, তৈজস পথে

পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ দেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে লইয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসজ্ঞ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীরমধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এযে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই! ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আস্‌ছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদ-গ্রস্ত। হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটীকে গৃহমধ্যে মাটীর উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী প্রাচীনা নহেন, কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তাহার বয়স অনুমান করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময়বিশেষে তাহার সৌন্দর্য্য ছিল—এমন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্রবস্ত্র অত্যন্ত মলিন;—এবং শতস্থানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, এখন সে চক্ষু নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল "একে কোথায় পেলেন ?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপসেক করিলে, বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত তাহাকে আর্দ্র বস্ত্রের পারবর্ত্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, বোধ হয় অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু করিয়া দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির গরু ছিল,—ঘরে দুধও ছিল, তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল।

"মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা ?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক বলিল, "আমি কোথা ?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "আমি তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি, তুমি কোথা যাইবে ?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেক দূর।"

হরমণি। তোমার হাতে রুলি রহিয়াছে, তুমি কি সধবা ?

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল, হরমণি অপ্রস্তুত হইল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব ? তোমার নাম কি ?

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

রঘুনাথজী হাবিলদার

[৺রমেশচন্দ্র দত্ত।]

[রমেশচন্দ্র দত্ত,—১৮৪৮খৃঃ অব্দে কলিকাতায় রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ১৯০৯ খৃঃ অব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। গভীর আনন্দের কথা যে, ইনি উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তৎকালীন বঙ্গভাষার অবজ্ঞাপঙ্ক-মোচনের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার, যত্ন সমধিক সাফল্যলাভও করিয়াছে। রমেশচন্দ্র জাতীয় পতন ও অভ্যুদয়ের হেতু প্রদর্শন করিতে 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র-জীবন প্রভাত' নামক দুইখানি সুন্দর লোকপ্রিয় গ্রন্থে অনেকগুলি চরিত্রচিত্র অতি উজ্জ্বল রাগে চিত্রিত করিয়াছিলেন। 'রঘুনাথজী হাবিলদার' উহাদেরই একটি অনুপম চিত্র। ইহা 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' হইতে গৃহীত। এতদ্ব্যতীত দত্ত মহাশয় 'বঙ্গবিজেতা' 'সমাজ' 'সংসার' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি সুন্দর উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ভারতের অর্থনীতি ও প্রাচীন সভ্যতাবিষয়ে ইহাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধে মৌলিক গবেষণার সুন্দর পরিচয় দেয়। ইহাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনা-পটুতা সহজে পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করে]।

কঙ্কন প্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে; ১৬৬৩ খৃঃ অব্দের বসন্তকালেই একদিন সায়ংকালে সেইরূপ ঘোর ঘটা দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্য এখনও অস্ত যায় নাই, অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী অতি কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত ও চারিদিক্ পর্ব্বতশ্রেণীও অরণ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশে বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই; যেন অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জানিয়া সমস্ত জগৎ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ

পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্ব্বতগুলি গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর নীচে উপত্যকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বত-প্রবাহী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া, একমাত্র অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেনপূর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত। অশ্বারোহীর বেশ কর্দ্দমময়, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বর্শা, কোষে অসি, বাম হস্তে বল্গা ও বাম বাহুতে ঢাল; পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ রাজস্থান-দেশীয়। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ হইবে, অবয়ব উন্নত ও গৌরবর্ণ, কিন্তু পরিশ্রমে বা রৌদ্রতাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে। শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত, ললাট উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ, মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, বল্গা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্শা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন ও হস্তদ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা আসিবে, তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইতেছে এবং অনন্ত পর্ব্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে। দুই একটি স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে; এইবার যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজল পতিত হইল। এখন যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু যুবকের চিন্তা করিবার

সময় ছিল না। তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সহে না, তিনি যে প্রভুর কাজ করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনেন না; যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্শা হস্তে লইয়া লম্ফ দিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় বেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্ব্বত প্রদেশের সুপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল। মেঘের গর্জ্জনে সেই অনন্ত পর্ব্বতপ্রদেশ যেন শতবার শব্দিত হইল। অচিরাৎ কোটি-রাক্ষসবল বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে পবন প্রবাহিত হইয়া যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। শত পর্ব্বতের অসংখ্য পাদপশ্রেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, জল-প্রপাতও পর্ব্বততরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে বজ্রশব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। ত্বরায় মুসলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পর্ব্বত, অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল, জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে স্ফীতকায় ও উচ্ছলিত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতে প্রতিরুদ্ধ না হইয়া সাবধানে চলিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে সজোরে নীচে বিক্ষিপ্ত হইবে। বায়ুপীড়িত বৃক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছিন্ন হইল; তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু রুধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে

অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য ; সুতরাং মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা না করিয়া যতদূর সাধ্য সতর্কভাবে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। দুই তিন দণ্ড মুসলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, অচিরাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল, অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতরাশির ও নবস্নাত বৃক্ষসমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল।

যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া এক বার অশ্ব থামাইলেন ও সিক্ত কেশগুচ্ছ পুনরায় সুন্দর প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যতদূর দেখা যায়, দুই তিন সহস্র হস্ত উন্নত পর্ব্বতশিখরগুলি শোভা পাইতেছে, ও সেই পর্ব্বতসমূহের পার্শ্বে, মস্তকের চারিদিকে নবস্নাত নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্য্যালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত দশগুণ স্ফীতকায় হইয়া বর্দ্ধিতগৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে, সূর্য্যের সুবর্ণরশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানাবর্ণ ধারণ করিয়াছে, জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে, আকাশে প্রচণ্ড ধনু নানা বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া মেঘরাশি বৃষ্টিরূপে গলিত হইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন ; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, ঝন্‌ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, অধিক সকালে পৌঁছেন নাই ; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।

যুবক। সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই ; ভবানীর প্রসাদে প্রভুর

নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা রাখিব ; অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।

দ্বাররক্ষক। কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যুবক তৎক্ষণাৎ কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন, ও সম্যক্ অভিবাদন করিয়া নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার শিবজীর মাউলীজাতীয় একজন বিশ্বস্ত যোদ্ধা। তিনি লিপিগুলির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশপূর্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধোদ্যম, যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সাহায্য করিতে পারেন, ও কোন্ কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, কিল্লাদার লিপিপাঠে সমুদায় অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের বালকোচিত উদার মুখমণ্ডল ও আনয়নবিলম্বী নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ দেখিয়া কিল্লাদার একবার চমকিত হইলেন। লিপির দিকে দেখিলেন, আবার বালক বা যুবার দিকে মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন— "হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে রাজপুত?"

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নামাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। তুমি আকৃতি ও বয়সে বালকমাত্র। কিন্তু বিবেচনা করি, কার্য্যকালে পরাঙ্মুখ নহ।

রঘুনাথজী। যত্ন ও চেষ্টামাত্র মনুষ্যসাধ্য, বোধ হয়, তাহাতে প্রভু আমার ত্রুটি দেখেন নাই। সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।

কিল্লাদার। তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ-দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে?

রঘুনাথজী। প্রভুর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কার্য্যসাধনে তোমার যেরূপ যত্ন আকৃতিই তাহার পরিচয় দিতেছে।

রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত এবং তাঁহার ললাটে ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা, মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও রাজপুত সেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,—তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিও। আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে। আর প্রভু শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে, তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে হাবিলদার কার্য্যের অনুপযুক্ত নহে।

প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মস্তক অবনত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রোগীর সেবা।

[৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।]

[ভূদেব মুখোপাধ্যায় ;—১২৩২ সালে কলিকাতায় ভূমিষ্ঠ হন, এবং ১৩০১ সালে ইহাঁর জীবনাবসান হয়। ইহাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বনাথ সাতিশয় দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু তাদৃশ দরিদ্র হইয়াও পুত্রের নির্ব্বন্ধে পুত্রকে হিন্দু-

কলেজে পড়াইতে বাধ্য হন। ভূদেব ছাত্রজীবনে চিরদিন অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ভূদেবকে বর্ত্তমানকালের ঋষি বলিতে ইচ্ছা করে। বস্তুতঃ ইঁহার ন্যায় আর্য্যোচিত বলিষ্ঠহৃদয় পুরুষ এ যুগে বিরল। ভূদেব আমাদের সমাজ, পরিবার, আচারব্যবহার, রীতিনীতিবিষয়ে যেরূপ গভীর চিন্তা করিয়াছেন, এরূপ আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই চিন্তার অমৃতময় ফল—'সামাজিক প্রবন্ধ' 'আচার প্রবন্ধ, 'পারিবারিক প্রবন্ধ।' তীর্থাদির পরিকল্পনায় হিন্দু যে কি উচ্চভাব পোষণ করিতেন, 'পুষ্পাঞ্জলি' পাঠে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। ভূদেব বাবুর অন্যান্য গ্রন্থ—'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব', 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', 'স্বপ্ন লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'বিবিধ প্রবন্ধ' ভাগ ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থপাঠে ইঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও উদারতা ভাবের গভীরতা, এবং ভাষার কমনীয়তা দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়। ভূদেবের ভাষা স্বচ্ছ প্রসন্নসলিল হ্রদের ন্যায় তৃপ্তিপ্রদ। ইহাতে অবগাহনে শরীর মন শীতল হয়: ভূদেব বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের দুর্দ্দশা-মোচনে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। তাই তিনি জীবনে যা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সমুদয় শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।]

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহমমতা কম—স্বার্থপরতা বেশী—আত্মত্যাগশক্তি ন্যূন—বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী-পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কত দূর করা উচিত, আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলিয়াই বোধ হইতেছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের টাকা এক ও মন এক হইয়া যায়। এইস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। আস্তাবলে যদি একটা ঘোড়া পীড়িত হইয়া পড়ে, তবে আস্তাবলের সকল ঘোড়া

পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে—গোশালায় একটা গরু রুগ্ন হইয়া পড়িলে, আর যে গরু তাহাকে দেখিতে পায়, সেই উব লেজ করিয়া দৌড়াইতে চায়—কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়না, চটকপ্রভৃতি সকল পশু-পক্ষীরই এই ব্যবহার। প্রায় কেহই স্বজাতীয় পীড়িতের সমীপে গমন করিয়া তাহার গা ঝাড়িয়া বা চাটিয়া দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব পীড়িতের শুশ্রূষা পাশব ধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। যে মনুষ্যজাতির মধ্যে পাশবভাব অল্প, সেই জাতীয় ব্যক্তি পীড়িতের সেবায় তত অধিক যত্নশীল হইয়া থাকে।

যদি রোগীর সেবায় কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগ-মুক্ত করা। রোগীর মনে ভয়সঞ্চার হইলে রোগমুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এই জন্য এমন ভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে, তাহার জন্য পরিবার অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, পুত্র, কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল, আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে, সে রোগীর ঘরে আসিল—তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি খাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ, ইহাই বুঝিবে না, কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শায়িত তুমি রাত্রিদিন তাহার মলিন মুখমণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ; খাইতে যাও না, শুইতে যাও না, একেবারে শরীর পাত করিতেছ; যদি শিশু তোমার দুগ্ধ খায়—তবে

তোমার শোকবিহ্বল হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য, তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে ; তুমি অধীরা হইয়া শিশুর ত কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিত স্তন্যরূপ বিষ পান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন কচি নয়—তোমার ক্রন্দনের হাহতাশের, উপবাসের এবং অনিদ্রার প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে, এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটি নষ্ট করিও না। এই জন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন, পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চোখের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্য—কৌতুক—বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে, আমি তাহার পীড়ায় কিছুই ভীত হই নাই? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারের অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্ম্মম এবং হৃদয়শূন্য মনে করিবে, অথবা স্বয়ং হাস্যপরিহাসে যোগ দিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে—তাহা বিনা কথনে বিনা ইঙ্গিতেও বুঝিবেন, এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না। স্বয়ং ধীর শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িতরূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থকিতে হয়। চুল্‌বুলে লোকেরা সর্ব্বদাই এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে, এক ভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চলদৃষ্টি হইতে হয়। তাহার হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্ব মূর্ত্তি এবং পূর্ব্ব ভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয় তাহার লক্ষ্যমধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককেও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। রোগীকে কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্মপ্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয় এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারেও না এবং চাহেও না; যদি করিতে হয় বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে সাধকের এই সকল গুণ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে। তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন, একটু জল চাই, কি দুই চারিটা দাড়িম্বের দানা চাই, গায়ের চাদরটা একটু গায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে, বালিসটা একটু উচু করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে, শীতল হস্তটি কপালে দিতে হইবে—ঠিক এতটুকু চাপিয়া বা আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু হাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হয়েন।

পরিজনগণ উল্লিখিত ভাবে সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিস, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহারও বস্ত্রাদির সহিত না মিশে, তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি বাটী

হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়; তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া বাটীর অপর লোকের, বিশেষতঃ বালকবালিকাদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে. স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা, এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ।

ভারতের অনার্য্যজাতি।

[৺রজনীকান্ত গুপ্ত।]

[৺রজনীকান্ত ১২৫৬ সালে ঢাকা-তেওতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩০৭ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার ন্যায় অনন্যাসক্ত সাহিত্যসেবী ও অনন্যাশ্রয় সাহিত্যজীবী আর কাহাকেও দেখা যায় না। 'আর্য্য কীর্ত্তি' ও 'সিপাহিবিদ্রোহের ইতিহাস' ইঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত ইনি আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থরচনায় গুপ্তমহাশয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইঁহার ভাষা বিশুদ্ধ গম্ভীর, প্রাণস্পর্শী।

অতি প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর লোক বাস করিত। আকারে ও আচারব্যবহারে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল

না। প্রথম শ্রেণীর লোক আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। অপর শ্রেণীর লোক অনার্য্য, অর্থাৎ আর্য্য হইতে সর্ব্বাংশে পৃথক্ ছিল। ইহারা দস্যু বা দল বলিয়া অভিহিত হইত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

প্রাচীন কালে আর্য্যগণ পঞ্জাব সিন্ধু প্রভৃতি যে যে জনপদে বসতি বিস্তার করেন, সেই সেই জনপদেই অনার্য্যগণ তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। ইহারা আর্য্যদিগের নিকটে মস্তক অবনত না করিয়া আপনাদের স্বাধীনতারক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হয়েন। তাঁহারা আপনাদিগের অধ্যুষিত জনপদ নিরাপদ করিবার জন্য ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। শেষে আর্য্যদিগের পরাক্রমে অনার্য্যগণ পরাজিত হয়। অনেকে বিজেতৃগণের অধীনতাস্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদের আশ্রয়ে বাস করে। অনেকে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে বা বিজন আরণ্য ভূখণ্ডে যাইয়া অবস্থিতি করিতে থাকে। আর্য্যদিগের ইতিহাসে কোনও সময়ে এই জাতি একবারে পদানত হয় নাই; এখন ভারতবর্ষে গারো, সাঁওতাল, কোল, ভীল, খন্দ প্রভৃতি যে সকল অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি দেখা যায়। অনেকের মতে, সেই সকল জাতির লোক আদিম অনার্য্যদিগের সন্তান।

এই সকল অনার্য্য, এখন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। আরণ্য বা পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহাদের বাসস্থান। ইহাদের পল্লীসমূহ সুরক্ষিত। ইহাদের দলপতিগণ বিশ্বস্ত ও আশ্রিত-পালনে যত্নশীল। দীর্ঘকাল বিভিন্ন স্থানে বাস ও বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ করাতে, ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর আচারব্যবহারও পরস্পর বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা নিরক্ষর হইয়াও নিষ্কপট, জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত না হইয়াও সত্যপ্রিয়, এবং সভ্যতার অনুমোদিত রীতিপদ্ধতির অনুগত না হইয়াও

সারল্যপূর্ণ ও স্পষ্টবাদী। ইহারা কোনও অপরাধ করিলে প্রায়ই অপরাধ স্বীকার করিয়া থাকে। সেই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও সত্য হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইতে ইহাদের প্রবৃত্তি হয় না। ইহারা প্রতিশ্রুতি-পালনে তৎপর, অতিথির প্রতি সদয়, দলপতির প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত। ইহারা আপনাদের দলপতির কার্য্যসাধনজন্য আত্মবিসর্জ্জনেও কাতর হয় না। ইহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি অটল, প্রতিজ্ঞা অবিচলিত এবং সাধনা অপ্রতিহত। ইহারা ভয়ে কাতর হয় না, আশঙ্কায় বিচলিত হয় না, বিপৎপাতেও অধীর হয় না। কেহ ইহাদের আবাসপল্লীতে উপনীত হইলে, ইহারা সরলভাবে তাহার অভ্যর্থনা করে, আগন্তুক কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে সরলভাবে তাহাকে সকল বিষয় জানাইয়া থাকে; এবং প্রয়োজন হইলে বহুযত্নে আগন্তুকের বহুমূল্য দ্রব্য রক্ষা করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদের সীমার মধ্যে আগন্তুকের পথপ্রদর্শক হয়; ঐ সীমা অতিক্রান্ত হইলে গ্রামান্তরের পথপ্রদর্শকের হস্তে তাহার রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। আগন্তুকের কার্য্যকলাপের প্রতি ইহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে; যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে ইহারা অবিলম্বে সেই বিষয় গ্রামের প্রধান পুরুষের গোচর করে। ইহারা বিবিধ আরণ্য জন্তুর বিবিধ পদচিহ্ন দেখিয়া, সেই সকল জন্তুর সন্ধান লইয়া থাকে। সিংহব্যাঘ্র হইতে শশকশৃগাল পর্য্যন্ত, সমস্ত জীবজন্তুর পদচিহ্ন ধরিয়া, সেই সকল জীবজন্তু কোথায় আছে ঠিক করিতে পারে। এই কার্য্যে ইহাদের এইরূপ নৈপুণ্য যে, দস্যুতস্করের পদচিহ্ন ধরিয়া, ইহারা তাহাদের সন্ধান করে। তস্করদিগের পদচিহ্ন ছোটবড় হইলে ইহারা কাঠি দিয়া উহা মাপিয়া লয়, এবং আপনাদের কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলে।

অনার্য্যদিগের এই সকল গুণ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে নাই। অনেক সময়ে উহাদের অসাধারণ বিকাশ দেখা গিয়াছে। অনেক সময়ে আর্য্যগণও অনার্য্যদিগের গুণগরিমার নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন। ইতিহাসে ইহাদের সাহস, পরার্থপরতা ও প্রভুপরায়ণতার বিবরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। মুসলমানগণ উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে ভারতবর্ষে সমাগত হইয়া, রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পাঠানেরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তখন বিভিন্ন জনপদ আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। মোগলের সময়ে ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রথম মোগলভূপতি যখন সমরখন্দ ও ফর্গনায় দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে উপনীত হয়েন, তখন আর্য্যবীর রাজপুতেরা তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। শেষে রাজপুতই সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় তদীয় পৌত্রের প্রধান সহায় হয়েন। আকবর মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্যের স্থাপনে ও প্রসারণে আর্য্যেরাই প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। আর্য্যের বাহুবলে মোগলসাম্রাজ্য কাবুল হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। মোগল যেমন ভারতবাসীর সাহায্যে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরেজও সেইরূপ ভারতবর্ষীয়ের সহায়তায় ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ইহাঁদের সহায় হইয়াছিল। মোগল আর্য্যের সাহায্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইংরেজ অনার্য্যের সাহায্যে আপনাদের বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের অসীম ক্ষমতা ও প্রাধান্য ছিল। ফরাসীশাসনকর্ত্তা ডুপ্লের নাম দক্ষিণাপথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোষিত হইয়াছিল। ক্ষমতাশালী বীর-

প্রধানেরা সর্ব্বত্র স্বতন্ত্রভাবালম্বন করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী তুপ্লে এই সময়ে বুঝিয়াছিলেন, মোগলসাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর একটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে পারে এবং ভারতবর্ষীয়গণ ইউরোপীয় সেনাপতির অধীন হইয়া ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে, উৎকৃষ্ট সৈনিক হইয়া উঠিতে পারে। নেপোলিয়নের ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠগণও এই সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ হইলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। তুপ্লে যখন এইরূপ সিপাহীসৈন্যসংগ্রহে তৎপর ছিলেন, তখন ইংরেজ কোম্পানীর সুযোগ্য কর্ম্মচারীরা দক্ষিণাপথে আপনাদের বাণিজ্যের উন্নতিবিধান করিতেছিলেন। এই সময়ে একটি দুঃশীল ও অনাবিষ্ট যুবক কোম্পানীর সামান্য কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া মান্দ্রাজে উপনীত হয়েন। শেষে এই যুবকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। যে ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিত, দোকানদারদিগকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য ও পয়সা সংগ্রহ করিয়া লইত, সর্ব্বদা নানা স্থানে উৎপাত করিয়া বেড়াইত, সে দক্ষিণাপথে অসীম ক্ষমতাশালী ফরাসী-দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ইহার আবির্ভাবে ফরাসীদিগের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইল। যাহারা এক সময়ে ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্যস্থাপনে যত্নশীল হইয়াছিল, তাহারা ইহার পরাক্রমে উৎসাহশূন্য হইয়া ইংরেজের ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিল।

লর্ড ক্লাইব কর্ণাটের অনার্য্যদিগের সহায়তায় দক্ষিণাপথে ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপন করেন। এই অনার্য্যগণ ইউরোপীয় সামরিক প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া কোম্পানীর সৈনিক দলে প্রবেশ করে। সুদূর দক্ষিণা-পথে সর্ব্বপ্রথমে এইরূপে কোম্পানীর সিপাহীসৈন্যের উৎপত্তি হয়। প্রধানতঃ এই সৈন্যই পলাশীতে ইংরেজদের সহায় হইয়া ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে।

অনার্য্যগণ কোম্পানীর সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া আপনাদের সাহস, পরাক্রম, প্রভুভক্তি, ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। ইহারা মত্বরাক্রমণে কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, আর্কটরক্ষণে কিরূপ সাহস ও প্রভুভক্তি দেখাইয়াছিল, কড্ডালুরে কিরূপ সুকৌশলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাশী সৈন্যের সহিত সঙ্গিনে সঙ্গিনে যুদ্ধ করিয়াছিল, জালালাবাদ রক্ষায় ভীমমূর্ত্তি আফগানের সম্মুখে কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। ভিন্ন দেশের ভিন্ন বর্ণের ও ভিন্ন ধর্ম্মের অধিনায়কের অধীন হইলেও ইহাদের প্রভুভক্তি কখনও বিচলিত হয় নাই। ইহারা নিদারুণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও বিপত্তিসময়ে আপনাদের যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্যদ্বারা বৃটিশ সেনার তৃপ্তিসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল; অসীমসাহসে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে বিপত্তিময়, দুরাক্রম্য স্থানে উপনীত হইয়া, আপন দলের পতাকা স্থাপন করিয়াছিল এবং যুদ্ধের সময়ে আপনাদের বহুপরিশ্রমলভ্য যৎকিঞ্চিৎ বেতনের অংশ দিয়া প্রভুর পরিতোষ জন্মাইয়াছিল। ইতিহাসে ইহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির নিদর্শন রহিয়াছে। ইহাদের মহত্ত্ব, একপ্রাণতা কর্ত্তব্যবুদ্ধি, স্বার্থত্যাগ ইহাদিগকে ইতিহাসে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের গৌরবস্তম্ভ কখনও বিচূর্ণিত বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, ইহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ কখনও বিলুপ্ত বা বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে না।

যখন মোগলসম্রাট্ আরঙ্গজেবের প্রবল প্রতাপ; কাবুল হইতে সুদূর দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে যখন মোগল সম্রাটের আধিপত্য; তখন পশ্চিমশৈলমালাশোভী ভূখণ্ডের বীরপ্রবর শিবজী স্বাধীন রাজ্যস্থাপনে উদ্যত হয়েন। তাঁহার পরাক্রমে দক্ষিণাপথে আওরঙ্গজেবের ক্ষমতার হ্রাস হয়। মোগল হিন্দুর নিকটে পরাজয় স্বীকার করে। শিবজীর সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও রণকৌশলসম্পন্ন সৈনিকগণ মাওয়ালী

নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা অনার্য্য। মওয়াল অর্থাৎ সহ্যাদ্রির উপত্যকা-ভূমি ইহাদের আবাসস্থান। মাওয়ালীদিগের পরাক্রম, সাহস, প্রভু-ভক্তি ও বিশ্বস্ততার বিবরণ ইতিহাসে বর্ণিত আছে, ইহাদের সাহসে সিংহগড়ে শিবজীর প্রাধান্য রক্ষিত হয়, ইহাদের তেজস্বিতায় দক্ষিণা-পথের মোগল সুবাদার পরাজিত ও পলায়িত হয়েন; ইহাদের ক্ষিপ্র-কারিতায় শায়েস্তা খাঁর পলায়নের সহিত পুনায় মোগলের আধিপত্য ও প্রভুত্ব অন্তর্দ্ধান করে। দক্ষিণাপথের যে অনার্যগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আধিপত্যস্থাপনে ইংরেজের সহায় হইয়াছিল, তাহারা রামুসী অর্থাৎ অরণ্যচর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহারা দুরারোহ পর্ব্বতপরিভ্রমণে, দুর্গম অরণ্যপর্য্যটনে, দুস্তর পার্ব্বত্য সরিৎ উত্তরণে অসামান্য ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

[৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।]

[রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্ব্বপুরুষ ভারতের পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় কেবল দ্বিতীয় হন. তদ্ভিন্ন যাবতীয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি ১৮৮৮ খ্রীঃ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এবং ১৮৯২ খ্রীঃ রিপণ কলেজে অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করেন। পরে উক্ত কলেজের

অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যমহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে স্থির থাকেন।

রামেন্দ্রসুন্দর 'প্রকৃতি', ''জিজ্ঞাসা', 'মায়াপুরী', 'জগৎকথা', 'চরিতকথা', এবং 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি অনেকগুলি অমূল্য গ্রন্থ বঙ্গসরস্বতীর ভাণ্ডারে উপহার দিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস—জ্ঞানের এই তিনটি ভাণ্ডার হইতে প্রচুর রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া যে যে মলিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাদের তুলনা নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা যেমন সরল তেমনি সরস। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অতি জটিল বিষয় অতি সরল ভাষায় কৌতুকের ছটায় দীপ্ত করিয়া রচনায় ইঁহার শক্তি অসাধারণ ছিল।

১৩০১ সালে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" প্রতিষ্ঠিত হয়. রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের প্রতিষ্ঠায় প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি ১৩০৫ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বিনয়নম্রভাবে লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থনা।" আমরা বলি ভগবান্ তাঁহার এ প্রার্থনা সুন্দররূপে পূর্ণ করিয়াছেন।]

পলাশীর লড়াইয়ের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়। বস্তুতঃই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাগ্‌যত, কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্-সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান! তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবল পর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে, কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখনও নোয়াইতে পারে নাই ; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে ; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখনও ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই ; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাঁহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়াই অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের না হউক পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই : কিন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ছিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে ; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায় বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ, আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদসত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব কিছুই তিনি অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, সেস্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারে প্রবেশ লাভ করে নাই। পর জীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন ; অনেক পাশ্চাত্ত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রে অনেক অনুকরণের

অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাহার চরিত্র কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে আস্ত আরশুলা উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যা-সাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরেজী একেবারে না শিখিতেন বা ইংরেজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামে টোল খানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য্য-আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তেমনই বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণদ্বারা পরত্ব-গ্রহণে তাঁহার কখনও প্রয়োজন হয় নাই, এমন কি তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি ; ইহার জন্য কখনও তাঁহাকে ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই।

চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায় দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল।

বাস্তবিক এই চটিজুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প, তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত আবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া লইতেন; এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচারবিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্ত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোন রূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাঁহার অধিকাংশই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লইবার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়; তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃত পক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে, ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িতেন এবং আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া

যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্যদেশের মানব-প্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে; কোনরূপ ক্ষতিলাভগণনার বা কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র যদি কখনও এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, সেই স্নেহাকৃষ্ট জননীর মত দুঃখক্লেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে পারা যায়। অনেক হিসাব নিকাশ জমা খরচ বিচারের পর কর্ত্তব্যনির্ণয় একরূপ ব্যাপার। আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকর্ত্তৃক প্রণোদিত ও তাড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়া আর এক রকম ব্যাপার।

মনুষ্যের ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কি না জানিনা; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্ম্মের কল্পনা অন্ততঃ একটা দেশের মানব-মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে দেশের সর্ব্ব প্রধান মহাকাব্যের নায়ক ভগবান্ রামচন্দ্র এই নিষ্কাম ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নীকে কর্ত্তব্যবোধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মপ্রচারক সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখ যাতনা হইতে মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণার্থ রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ না করিয়া পারেন নাই, যে দেশের উপাস্য মানবদেব শ্রীকৃষ্ণ এই নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই, তাহা সম্ভবে।

কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য ও অভিগম্য।

রামায়ণ ও উত্তর-চরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তর-চরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলে রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকাবিধবার মলিন মুখদর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদনব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বচ্ছন্দতাকে তৃণের অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের

উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁসিতে পারিত না। বায়ু-প্রবাহে দ্রুম-সানুমানের মধ্যে দ্রুমের চাঞ্চল্য জন্মে; সানুমান চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যেও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ক্লিফোর্ডের কীট।

[৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।]

এতদিন আমরা ভাল ছিলাম; অন্ততঃ মনের শান্তি ছিল। ব্যাঘ্রাদি জন্তু মধ্যে মধ্যে লোকালয়ে পদার্পণ করিয়া আমাদের দুই চারিটাকে উদরগত করে এবং বিছানার নীচে হইতে সাপ বাহির হইয়া সহসা আমাদিগকে যমালয়ে পৌছাইয়া দেয়; কিন্তু সভ্যতার বিস্তারে ইহাদের অভাব ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। সাপের বাঘের ভয় কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখন জলের গ্রাস মুখে তুলিলেই মনে হয়, এই বুঝি জীবলীলা শেষ হইল, কোন্ বাসিলস্ অজ্ঞাতসারে দেহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বস্তুতঃ আমাদের এই নব পরিচিত ক্ষুদ্র জাতিগণের বংশবিস্তার ও

পরাক্রম দেখিয়া মনে হয়, আমরা বাঁচিয়া আছি ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কিছুই হইতে পারে না। আমরা যে অদ্যাপি সগর্ব্ব পদক্ষেপে ধরা-পৃষ্ঠ কম্পিত করিতেছি, সে বাসিলস্‌গণের অসামান্য সহিষ্ণুতার পরিচয় ও জলন্ত ত্যাগস্বীকারের পরা কাষ্ঠা বলিতে হইবে। প্রকৃতিমাতার বহুযত্নে লালিত ও বহু যুগেব প্রয়াসে গঠিত ও পুষ্ট মানুষের এই সুন্দর তনুখানি এত সহজে বাকৃটিরিয়াকর্তৃক আঙ্গারাম্ল বায়ুতে পরিণত হইতে দেখিয়া প্রকৃতিমাতা কাঁদেন কি হাসেন বলিতে পারি না; আমাদের কিন্তু আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিশেষ আনন্দের কারণ নাই।

ইহাকেও পারা যায়। কিন্তু মানুষের বহুযত্নের ধন জাগতিক রহস্যের তথ্যগুলিরও অবস্থা বিপৎসঙ্কুল দেখিলে মনে হয় আর শান্তি থাকে না। যে গুলিকে সনাতন সত্য বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি, বহু যুগের পর্য্যবেক্ষণফলে মানুষ যে সকল সত্যের আবিষ্কার করিয়াছে যখন দেখা যায়, সেই সত্যগুলিও অবিনাশী নহে মানুষের ক্ষণভঙ্গুর দেহের ন্যায় নশ্বর; মানুষ তাহাদের আবিষ্কার করে নাই, সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, এবং অপরাপর সৃষ্ট পদার্থের ন্যায় তাহাদেরও বিনাশাশঙ্কা বর্ত্তমান; তখন আর শান্তি থাকিবে কিরূপে?

আকাশ অসীম; এই একটা মানুষের চিরপরিচিত সত্য। ইংরাজীত যাহাকে space বলে, সেই অর্থে আকাশ বলিতেছি। এখানে আকাশ অর্থে কেহ যেন শূন্যব্যাপী আলোকবাহী ঈথর না বুঝেন। এই সত্যটার সম্বন্ধে কাহারও কখন সংশয় ছিল না। আকাশের কি আবার সীমা আছে? এও কি কখনও হয়? অত বড় মনীষী ইমানুয়েল ক্যাণ্ট, যিনি মানুষের নানাবিধ দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিমূলে সবলে আঘাত করিয়া গিয়াছেন, এই সংস্কারটাকে আক্রমণ করিতে তাঁহারও সাহস হয় নাই। আকাশের অসীমতা

লইয়া আমরাই কত দীর্ঘচ্ছন্দ ভাবগম্ভীর বক্তৃতা করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই সত্যটার শরীরেও বাসিলস্ ধরিয়াছে। এই বাসিলস্ ক্লিফোর্ডের কীট।

ক্লিফোর্ডের কীট কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন দেখিবেও না; অনুবীক্ষণ এখানে পরাস্ত। এই কীট মানুষের জ্ঞাতিমধ্যে গণ্য নহে; সুতরাং জীবতত্ত্ববিদেরা ইহার জ্ঞাতিকুলনিরূপণে অসমর্থ। অধ্যাপক ক্লীফোর্ডের কল্পনাকে ইহার জননী না বলিলেও ধাত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার আকৃতিও কিছু অদ্ভুত গোছের। অত বড় হাতীটা হইতে অত ছোট জীবাণু পর্য্যন্ত সকলের শরীরের দৈর্ঘ্য আছে, বিস্তার আছে, বেধ আছে, ইহার কেবল আছে দৈর্ঘ্য; বিস্তারও নাই বেধও নাই। জ্যামিতিশাস্ত্রে বিস্তার-বেধহীন দৈর্ঘ্য-মাত্রময় রেখানামক পদার্থের কল্পনা আছে। ক্লিফোর্ডের কীটের শরীরে ক্ষুদ্র একটু রেখামাত্র। ইহার লীলাভূমিও ইহার শরীরের অনুরূপ।

আমরা যেমন দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধময় ত্রিগুণ জগতে বিচরণ করি, এও তেমনি সচ্ছন্দে দৈর্ঘ্যমাত্রসার একটি বৃত্তপথে চলিয়া বেড়ায়। সেই বৃত্তটি অথবা সেই বৃত্তের পরিধিটিই তাহার জগৎ। সেই বিস্তার-হীন জগতে তাহার বিস্তারহীন শরীর লইয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। হইতে পারে তাহার অনুভবশক্তি বুদ্ধিশক্তি ইচ্ছাশক্তিপ্রভৃতি মানসিক বৃত্তি মানুষেরই মত; কিন্তু তাহার সমুদয় জ্ঞান সেই ক্ষুদ্র বৃত্ত পরিধিতেই সীমাবদ্ধ। তাহার বৃত্তপথের অর্থাৎ তাহার নিজ জগতের বাহিরে যে আর একটা বিশালতর জগৎ আছে, যাহাতে চন্দ্রসূর্য্য নির্দ্দিষ্ট বিধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহাতে বাক্‌টিরিয়ানামক জীবের বংশ-বৃদ্ধির জন্য মনুষ্যনামক জীব অবস্থান করিতেছে, সে জগতের কোন

সংবাদ রাখে না; সেই জগতের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানপ্রাপ্তির তাহার উপায় নাই। কিরূপেই বা সে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবে? তাহার শরীর, তাহার ইন্দ্রিয়, তাহার মনোবৃত্তি সমুদয়ই তাহার আপন রেখাময় জগতের অনুরূপ; বহিস্থ বৃহত্তর জগতের সম্বন্ধে জ্ঞানের আহরণোপযোগী ইন্দ্রিয়ই তাহার নাই; সেরূপ কোন ইন্দ্রিয় তাহার থাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু সে নিজের জগতের প্রভু। সেই খানে মনের আনন্দে সে এদিকে ওদিকে অথবা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচরণ করে; সজাতীয় কীটদের সহিত আহার ব্যবহার করে; এবং চির জীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ বিহারভূমির শেষ সীমা না পাইয়া অবশেষে গম্ভীর ভাবে সিদ্ধান্ত করে যে, তাহার জগতের সীমা নাই।

ক্লিফোর্ডের কীটের এই স্থির সিদ্ধান্তে আমাদের হাসিবার অধিকার আছে; কিন্তু হাসির সঙ্গে আমাদের একটু শিক্ষালাভও হইতে পারে। আরব্য-উপন্যাসের বন্দী পিশাচ বুদ্ধিবিষয়ে যেমনই হউক, ক্ষমতাবিষয়ে বড় যে সে ছিল না; আপনার অত বড় শরীরটা ইচ্ছামাত্রে সঙ্কীর্ণ করিয়া ছোট কুপীর ভিতর পূরিয়াছিল। কিন্তু সেও আপনার দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধযুক্ত শরীরটাকে কেবল দৈর্ঘ্যমাত্রে পরিণত করিয়া একটি ইউক্লিডের রেখার ভিতর পূরিতে পারিত কি না সন্দেহের বিষয়। আমাদের ত কথাই নাই। যাহা হউক, আমরা রেখার ভিতর বাস করিতে না পারি, রেখার কল্পনা করিতে পারি; শুধু রেখা, কেন দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এই দুই গুণযুক্ত অর্থাৎ দ্বিধা বিস্তৃত স্থান,—যেমন কোন বস্তুর পিঠ অথবা তল, তাহারও কল্পনা করিতে পারি। ইউক্লিডের প্রসাদে স্কুলের ছাত্র-মাত্রেই এই দুই কল্পনায় পটু। দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ এই তিন গুণযুক্ত অর্থাৎ ত্রিধা-বিস্তৃত দেশ,—তাহার কল্পনার প্রয়োজন নাই,—সেরূপ দেশে ত আমরা বাসই করিতেছি।

আমরা যাহাকে আকাশ বলি, যে আকাশে একটু না একটু অংশ ব্যাপিয়া আমাদের শরীর অবস্থিত ও আমাদের জ্ঞানগোচর পদার্থমাত্রই অবস্থিত, তাহাই এই তিনগুণযুক্ত ত্রিধাবিস্তৃত দেশ। কিন্তু এই তিন গুণের অধিক চতুর্থ গুণ আমরা বুঝি না; তিন দিকে প্রসারিত ব্যতীত চারি দিকে প্রসারিত চতুর্ধাবিস্তৃত দেশ আমাদের কল্পনাতেই আসে না। দৈর্ঘ্যময় রেখা কল্পনায় আসে; দৈর্ঘ্যবিস্তারময় তল কল্পনায় আসে; দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধময় দেশ ত আমাদেরই বাসভূমি। কিন্তু দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ ব্যতীত আরও একটা পৃথক্ গুণযুক্ত দেশ থাকিতে পারে; আমাদের জগৎটার চেয়ে আরও একটা প্রশস্ততর জগৎ থাকিতে পারে; সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের নাই; সেরূপ জ্ঞানলাভের কোন উপায় নাই; সে আমাদের কল্পনারও অতীত। কল্পনার অতীত বটে; কিন্তু সেরূপ জগৎ নাই কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? ক্লিফোর্ডের কীটও ত আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের জগতের অস্তিত্ব, কল্পনা করিতে পারে না। যাহা তাহার জ্ঞানসীমার ভিতরে, তাহাই তাহার কল্পনার আয়ত্ত; যাহা তাহার জ্ঞানের সীমার বাহিরে, তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। কে জানে যে আমাদের অবস্থা ক্লিফোর্ডের কীটের মত নহে? কে বলিতে পারে আমাদের জগৎ আর একটা ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, ভিন্ন নিয়মে চালিত, ভিন্নজীবাধ্যুষিত, বৃহত্তর জগতের ভিতরে নিহিত নয়? কে বলিতে পারে যে, আমরাও ক্লিফোর্ডের কীটের মত নিজ সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পরিধিযুক্ত, ক্ষুদ্র জগতে বাস করিতেছি না, এবং আমাদের সীমাবদ্ধ মনোবৃত্তির প্রকাশস্থল, এবং সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বিষয় সসীম জগৎকে অসীম ভাবিয়া আস্ফালন করিতেছি না? আমরা ইহার সীমা পাই নাই বলিয়া, এ জগতের সীমা নাই, এ কিরূপ বিচার?

ক্লিফোর্ডের কীটের অবস্থা ভাবিলে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা-গুলির স্বতঃসিদ্ধতাসম্বন্ধে ঘোর সংশয় আসিয়া পড়ে। এই স্বতঃ-সিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের জ্ঞানায়ত্ত আকাশের ধর্ম্মসম্বন্ধে আমা-দের উপার্জ্জিত সিদ্ধান্তমাত্র। আমাদের আকাশের যতটুকু আমরা দেখিতে পাই, এই আকাশের যতদূর পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানের ভিতরে আসে, ততটুকুতেই এই ধর্ম্মগুলি বর্ত্তমান; এবং আমরা যতদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছি, অতীতের যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে পাইতেছি, তত দিন এই ধর্ম্মগুলির কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই; এই পর্য্যন্তই আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। আকাশের সর্ব্বত্র এই ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে অথবা এই ধর্ম্মগুলি চিরকাল ধরিয়া এইরূপ অপরিবর্ত্তিত ভাবে রহিয়াছে, এতদূর বলাও মানুষের প্রগল্‌ভতা।

রুশীয় পণ্ডিত লবাচুস্কী ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলি বর্জ্জন করিয়া নূতন জ্যামিতিশাস্ত্র গঠন করেন। জর্ম্মনির রাইমান ও হেলমহোলৎজ তৎপরে এই সংশয়বাদ প্রচার করিয়াছেন; লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক ক্লিফোর্ড ইংলণ্ডে এই মতের বিস্তার করেন। ক্লিফোর্ডের অকাল মৃত্যু না হইলে আমরা আরও অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইতাম।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

[৺শিবনাথ শাস্ত্রী]

[৺শিবনাথ শাস্ত্রী—যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মাদিগের একজন। ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম। ইনি ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺হরানন্দ বিদ্যাসাগর। শাস্ত্রী মহাশয়ের এমনি ধর্ম্মপ্রভাব ছিল যে, কত পাষাণহৃদয়ও ইহাঁর মুখে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে ইহাঁর পাদপদ্মে প্রণত হইত। যিনি একবার এই দীর্ঘশ্বেতশ্মশ্রু নির্ব্বিকার ঋষিকল্প মহাপুরুষের পবিত্র মধুর সঙ্গ লাভ করিতেন, তিনি ইহাঁর অসাধারণ লোকরঞ্জনী শক্তি এবং অপূর্ব্ব হৃদয়মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হইতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের অসামান্য চরিত্রপ্রভাব ইহাঁর ভাষার ভিতর দিয়াও বেশ ফুটিয়াছে। ইহাঁর ভাষা সংযত, তেজঃপূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী। ইনি অদ্ভুত ভাবগ্রাহিতা ও ভাবোদ্দীপনের নৈপুণ্যবলে ভাষাকে কি সুন্দর প্রাণময়ী করিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে পাঠককে তন্ময় করিয়া লয়েন। ইহাঁর মানবচরিত্রবিশ্লেষণ করিবার শক্তিও অসাধারণ, উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। '৺রামতনু লাহিড়ী ও তাৎকালিক বঙ্গসমাজ', 'মেজ বউ', 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'হিমাদ্রিকুসুম', 'ছায়াময়ী-পরিণয়' প্রভৃতি গদ্য পদ্য অনেকগুলি উপাদেয় গ্রন্থ এবং বহুসংখ্যক সুলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয় মাতৃভাষার অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর স্বরচিত জীবন-চরিত ও ইহাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীপ্রণীত 'আচার্য্য শিবনাথ' এই অতি উপাদেয় গ্রন্থদ্বয় সকলের যত্নের সহিত পাঠ করা উচিত।]

একটি তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি যে জল বৃষ্টি ঝটিকা সহিয়া যুগ যুগ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা কি শূন্যকে আশ্রয় করিয়া? কখনও নহে। তাহা সুদৃঢ়

ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং যে সকল আভ্যন্তরীণ ধাতুপুঞ্জের সংঘাত দ্বারা তাহার দেহ গঠিত, সে ধাতুপুঞ্জও ঘননিবিষ্ট এইজন্য ; তদ্ভিন্ন গিরি কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। গিরি যে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া ; নিরন্তর বর্ষার জলধারা তাহার অঙ্গসন্ধিকে শিথিল করিতেছে ; তাহার দৈহিক ধাতুসকলকে ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে ; বহুল শিলাখণ্ড অশনিনিনাদে শৃঙ্গ হইতে পাদদেশে পাতিত করিতেছে ; চক্ষের নিমিষে তরুলতার শ্রীসৌন্দর্য্য সকলই হরণ করিয়া লইতেছে, আবার কখনও বা ভীষণ ভূকম্পে ঐ গিরিদেহ বিদারিত হইয়া জ্বালামুখী প্রকাশ পাইতেছে ; শত শত বনপ্রদেশ ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া নেত্রের অগোচর হইয়া যাইতেছে ; কোথাও বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, অবিশ্রান্ত জ্বলিয়া, সুদূরপ্রসারী অরণ্যানীসকলকে ভস্মীভূত করিতেছে। গিরির জীবন কি সংগ্রামের জীবন ! কিন্তু এই সংগ্রামের মধ্যেও গিরি দণ্ডায়মান আছে ; শীতাতপ সহিয়া বিধাতার কাজ করিতেছে ; গিরির ভিত্তি দৃঢ়, গিরির দেহের বন্ধন দৃঢ় বলিয়া। এ জগতে একজন মহামনা ব্যক্তিকে আমার এই গিরির সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন্ গিরি এমন আছে, যাহার শীতাতপের সহিত সংগ্রাম নাই ? তেমনই, কোন্ মহৎ চরিত্র এমন আছে, বিধির প্রতিকূল অবস্থার সহিত যাহার সংঘর্ষণ নাই ? আবার কোন্ গিরি এমন আছে, যে নিজের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার গুণে দণ্ডায়মান নয় ? তেমনই কোন্ মহৎ চরিত্রই বা এমন আছে, যাহা আভ্যন্তরীণ উপাদানসকলের গুণেই মহৎ নয় ?

এ জগতে যিনি উঠেন তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া, সাধারণের মধ্যেই বাড়িয়া, সাধারণের উপর মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান ; তিনি আভ্যন্ত-

গুণ মাল মশলার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কুষ্মাণ্ড যেমন যষ্টির সাহায্যে মাটীর উপরে উঠে, তেমনি কোন্ কাপুরুষ কোন্ অলস শ্রমকাতর মানুষ, কেবলমাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া, পড়িয়া, বহিয়া, সহিয়া, ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া, কাঁদিয়া, কাটিয়া মানুষ হইতে হয়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়;" মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্বলাভের অন্য রাস্তা নাই। ঈশ্বর মানুষের সহিত চুক্তি করিয়া অল্প আয়াসে মহত্ত্ব প্রদান করেন না।

আমি এরূপ একটি মহৎ চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি রামমোহন রায়। নচিকেতা তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "শতানামেমি প্রথমঃ," আমি শত জনের মধ্যে প্রথম হইতে চাই। রামমোহন রায় যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে সময়ে এ দেশবাসী-দিগের ভিতরে লক্ষের মধ্যে—লক্ষের কেন কোটির মধ্যে—তিনি প্রথম হইয়াছিলেন বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? সে কালের লোকের কথাই বা বলি কেন? তাঁহার জন্মের পর এই ত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে? কে প্রকৃত মহত্ত্বগুণে তাঁহার ত্রিসীমামধ্যে আসিতে পারিয়াছে?

বলিতে কি, শঙ্করের পর এমন মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ আর এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই প্রদীপ্ত দিবাকরের নিকটে আমরা কি খদ্যোত নহি?

কিন্তু রামমোহন রায় যে লক্ষের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তাহা কিরূপে? যেরূপ ক্ষুদ্র গিরিরাজির মধ্যে অত্যুন্নত গিরি-শৃঙ্গ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি যে তিনি সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে উন্নতশিরা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা কোন্ গুণে? তাহাও পূর্ব্বো-ল্লিখিত গিরিদেহের ন্যায় আভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের সাহায্যে।

প্রথম উপাদান, তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানব-আত্মার মহত্ত্ব জ্ঞান। মানবের আত্মাকে তিনি অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত। তাঁহা হইতেই উৎপন্ন; তাঁহাদ্বারা বিধৃত, এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার নিয়তি; ইহার আশা ও শক্তি অসীম। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার এবং দাসত্বকে তিনি এইজন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন যে, তদ্দ্বারা মানবাত্মাকে শৃঙ্খলিত, শক্তিহীন ও আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে বঞ্চিত করে।

এই মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান, আর একদিকে অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের এমনই একটা প্রভাব ছিল, এমনই একটা মহাপুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাঁহাকে কোনও ছোট কাজের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার সমীপে ছোট কথার অবতারণা করিতেও সাহসী হইতেন না।

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়া, তাঁহার স্বাবলম্বনশক্তি অসাধারণ ছিল। নিজের গূঢ় আত্ম-শক্তিতে এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না; কোন বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্য্যসাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন; এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। ইংরাজি বুল্‌ডগ্ নামক কুকুরের এইরূপ খ্যাতি আছে যে, সে এক বার যে প্রাণীকে কামড়াইয়া ধরে, নিজের দেহকে মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সে কামড় ছাড়ে না। রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুল্‌ডগের কামড়ের ন্যায় ছিল;

তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। বরং সে পথে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হইত, ততই তাঁহার বীরহৃদয় আনন্দিত হইত। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন সম্মুখে বেড়া দেখিলে আনন্দিত হয়, যে, উল্লম্ফন এবং উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু পাওয়া গিয়াছে, তেমনই তাঁহার নির্ভীক হৃদয় বিঘ্ন বাধা দেখিয়া আনন্দিত হইত, যে, উল্লম্ফন ও উল্লঙ্ঘনের উপযুক্ত কিছু আছে। বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যাওয়া, ভয়প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতাবশতঃ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজের শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বনশক্তি তাহার আসে না। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে, কি ছোট হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন-বাধা, পাপপ্রলোভন, জীবনের সমস্যা, সকলেরই পথে উপস্থিত হয়; তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি বড়; আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এইজন্য আমরা ছোট। তিনি যে উপরে উঠিয়াছিলেন, তাহারও ভিতরকার কথা, নিজের শক্তিসামর্থ্যে ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় উপাদান, সকল মহাজনের কার্য্যের মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার কার্য্যের মূলে ছিল। তাহা এই "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ইহা অনুভব করা, যে এই ভৌতিক জগৎ যেমন দুর্ভেদ্য কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তেমনই মানবের জীবন ও মানবসমাজ দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত। এক মহাশক্তি বা মহতী ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহতী ইচ্ছার

দ্বারা বিধৃত হইতেছে, সেই ইচ্ছা ও সেই শক্তির দ্বারা মঙ্গলের পথে নীত হইতেছে। "স সেতু বিধৃতিরেষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়" —তিনি সেতুস্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। মানবজীবন তাঁহারই দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহারই শাসনাধীন, সুতরাং এখানে ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুভব করি, তাহার অনুসরণ করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; ফলাফল সেই ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষের হস্তে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই মহৎ ভাব হইতেই সকল ধর্ম্মবীরের বীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায়ের বীরত্বও ইহা হইতে উঠিয়াছিল; সে বীরত্বের কথা যখন স্মরণ করি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা আপনার জীবনকে ও শক্তি-সকলকে ঈশ্বরের ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করা। আমার মানসিক বৃত্তি, দৈহিক বল, লৌকিক ও সামাজিক সুবিধা, সমুদয় সেই মঙ্গল-পুরুষের গচ্ছিত ধন; তাঁহার ইচ্ছা-অনুসারে ব্যয় হইবার জন্য, তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধনের জন্য,—এই ভাব। ইহা ব্যতীত কোন মহাজনের জীবন মহৎ হয় নাই; কোনও মনুষ্য এ জগতে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। সকল মহামনা মনুষ্যের জীবনে এক অপূর্ব্ব বাধ্যতার ভাব দেখা গিয়াছে। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া কাজ করাইয়া লইয়াছে; বাধ্য করিয়া খাটাইয়াছে; তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা না করিয়া পার নাই। সেণ্টপল এক স্থানে বলিয়াছেন "The love of Christ constraineth me" অর্থাৎ যীশু-প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে। কেবল পলই যে এই প্রকার বাধ্যতা অনুভব করিয়াছেন তাহা নহে। প্রত্যেক মহামনা মানুষ এই বাধ্যতা অনুভব

করিয়াছিলেন। এই যে জীবনের ভিতরে দায়িত্ব জ্ঞান, এই যে অস্ফুট কিন্তু নিরন্তরোদ্বেলিত বাধ্যতাজ্ঞান, ইহা ভিন্ন কে কবে বড় হইয়াছে? কে কবে বজ্রমুষ্টিতে কার্য্য করিয়াছে? কে কবে বীরের ন্যায় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে? রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, "যে যা বলে বলুক, যে যা করে করুক, লোকে দেখুক না দেখুক, আমার জীবনের পূর্ণতা আমি লাভ করি।" তুমি আমি যদি বিশ্বাসে বা প্রেমে এতটা ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে তুমি আমিও বীরের ন্যায়, কাজ করিয়া যাইতে পারিতাম। এই দায়িত্বজ্ঞান হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ ফুটিয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তাহা পূর্ণাঙ্গ না করিয়া ছাড়িতেন না; যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। বালকের ন্যায় লঘুভাবে কাজে হাত দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তৎপরে তাঁহার ঈশ্বরে যেমন অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তেমনই মানবের প্রতি উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরপ্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যের চালক ও পোষক ছিল। এই উদার ভাব হইতেই, তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের দুঃখ সহিতে পারেন নাই, সেই জন্য দুষ্কর নরসেবাব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটি মূল মন্ত্র উঠিয়াছিল সেটি "The service of man is the service of God" অর্থাৎ মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এইটি সর্ব্বদা তাঁহার মুখে শুনা যাইত, তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার মানব-প্রীতি অপরাপর অনেক মহাজনের মানব-প্রীতির ন্যায় সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তিনি যে সর্ব্বদেশের ও সকল জাতির

নরনারীর দুঃখে দুঃখিত হইতেন; সকল দেশের রাজনীতির প্রতি এত দৃষ্টি রাখিতেন, যে কোন জাতির কোনও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যে এত আনন্দিত হইতেন, তাহার ভিতরকার কথা এই ছিল যে. তাঁহার প্রেম সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

ধর্ম্মের জয়।

[৺শিবনাথ শাস্ত্রী।]

ধর্ম্মের জয়ের অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্য্যতার জ্ঞান কি মানবের প্রকৃতিনিহিত নয়? রামায়ণ ও মহাভারত এই উভয় গ্রন্থের প্রতি এ দেশের সর্ব্বসাধারণের এত শ্রদ্ধা ভক্তি কেন? তাহা কি এই জন্য নয় যে, এই উভয় গ্রন্থেরই উপদেশ এই—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'? রামায়ণের কবি দেখাইতেছেন, এক দিকে অরণ্যচারী, রাজ্যভ্রষ্ট ও কতিপয় কপি-সৈন্যমাত্রসহায় রাম, অপর দিকে লঙ্কেশ্বর রাবণ, যার প্রতাপে স্বর্গ মর্ত্ত্য কম্পিত ও যার দ্বারে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণপ্রভৃতি দিক্‌পালগণ বাঁধা। পৃথিবীর গণনায়, বিষয়বুদ্ধির বিচারে, কে ভাবিতে পারিত, কবি দেখাইয়া না দিলে কে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিত যে, এই কপি-সহায় অরণ্যচারী রামের হস্তে এই রাবণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে? অথচ তাহাই হইল! নিজ বলদর্পে পাপকে বরণ করিয়া রাবণের এই হইল যে,—

"এক লক্ষ পুত্র তার সোয়া লক্ষ নাতি,
এক প্রাণী না রহিল বংশে দিতে বাতি।"

কি ভয়ঙ্কর শাস্তি! ঋষি মুখে বলিলেন না, কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে দিলেন,—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।'

মহাভারতেরও সেই কথা। কুরুপাণ্ডবেরা যুদ্ধোন্মুখ, কৃষ্ণ দারকা-পুরীতে বাস করিতেছেন। তিনি উভয় পক্ষের বন্ধু, কুটুম্বিতাসূত্রে উভয়েরই আত্মীয়, উভয় পক্ষই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কৃষ্ণ কি করেন! তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন; এক দিকে আপনাকে ও অপরদিকে আপনার নারায়ণী সেনা রাখিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—আমি উভয়ের বন্ধু, এক পক্ষ আমাকে লউক, অপর পক্ষ আমার নারায়ণী সেনা লউক।" দুর্যোধন স্থূলমতি, বিষয়বুদ্ধির পরবশ, পার্থিব ধনের প্রতিই তাঁহার অধিক দৃষ্টি, তিনি মনে করিলেন একা কৃষ্ণ লইয়া কি করিব? এক বাণের কর্ম্ম বৈ ত নয়; একা কৃষ্ণ গেলেই ত গেল! আমি নারায়ণী সেনা লই; ইহারা এক একজন এক একটি বীর, ইহাদের সাহায্যেই যুদ্ধে জয় লাভ করিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া কুরুরাজ নারায়ণী সেনা লইতে চাহিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন "তথাস্তু"। পাণ্ডবসখা পাণ্ডবদিগেরই রহিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সারথ্যে বরণ করিয়াছেন শুনিয়া প্রজাবৃন্দের মধ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণ নারায়ণী সেনা ফেলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু এমন কিছু লইয়া গেলেন, যাহা মহাবিশাল সৈন্যদল অপেক্ষাও বলবত্তর; যাহার গুণে একটা মানুষ লক্ষাধিক মানুষের অপেক্ষা বলশালী হয়! তাহা কৃষ্ণের চরিত্রের প্রভাব—তাহা কৃষ্ণের প্রতি প্রজাবৃন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর, যাহা প্রজাবৃন্দের ভক্তিতে প্রকাশ পাইল :—"জয়োস্তু পাণ্ডু-পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ। অর্থ—জয়, জয়, স্থির জানি পাণ্ডবের জয়; যে পক্ষে আপনি হরি নিলেন আশ্রয়।

প্রহ্লাদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। ভারতসাম্রাজ্যাধিপতি অতুল বিভবের স্বামী, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণপ্রভৃতি মহারথিগণ পরিবেষ্টিত রাজা-দুর্য্যোধন, ঐ বনবাসী গৃহতাড়িত কতিপয় পাণ্ডবের হস্তে স্ববংশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। আর এক ঋষি মুখে বলিলেন না, কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে দিলেন,—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিতেছেনঃ—

"সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।"

অর্থ—যে অনৃত—অসত্য বা অধর্ম্মকে বলে বা আশ্রয় করে, সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়,—তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশের ঋষিগণ যে স্বাক্ষ্য দিতেছেন, অপর দেশের ঋষিগণও সেই সাক্ষ্য দিয়াছেন।

ইহুদিরাজ ডেভিড্ বলিতেছেন :—

"ধাম্মিক মানুষের যে স্বল্প সম্পত্তি আছে, তাহা বহুসংখ্যক অধার্ম্মিক লোকের প্রচুর বিভব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ অধার্ম্মিকদিগের প্রতাপ চূর্ণ হইবে এবং প্রভু ঈশ্বর ধার্ম্মিকদিগকে জয়শালী করিবেন।"

সর্ব্বদেশের ঋষিগণের একই সাক্ষ্য। তাঁহারা জনগণকে বলিতেছেন তোমরা আশান্বিত হও, ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সংসারী মানুষকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা এরূপ কথা বলে না। চারিদিকে জনসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর, সর্ব্ব স্থলেই ধর্ম্মের জয় দেখা যায় না। প্রতিদিন, প্রতিগ্রামে, প্রতিনগরে ধনী দরিদ্রকে পীড়ন করিতেছে, অন্যায়পূর্ব্বক পরস্বহরণ করিতেছে, করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাস করিতেছে, উত্তরাধিকারিগণের জন্য সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যাইতেছে; জগতের বিস্তীর্ণ বাসভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, প্রবল জাতিগণ দুর্ব্বল

জাতিদিগের গলায় পা দিয়া তাহাদের স্বাধীনতা ও অর্থ হরণ করিয়া আপনাদের সাম্রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিতেছে ও সুখে বাস করিতেছে। কৈ, জগতের কার্য্যকলাপে ত দেখি না যে, সর্ব্বত্র ধর্ম্মই জয়যুক্ত হইতেছে? তবে কি ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী?

ভাবিয়া দেখ, 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ,' এই কথাটা মানবপ্রকৃতিতে এমনি নিহিত যে, মানুষ এ কথা শুনিতেও ভালবাসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, রামায়ণের কবি যদি ধর্ম্মের জয় না দেখাইয়া অধর্ম্মের জয় দেখাইতেন, যদি রামায়ণের উপসংহার এই হইত যে, রাবণ সীতাকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখে বাস করিতে লাগিল, রাম কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে ফিরিয়া গেলেন ও অজ্ঞাতবাসে মরিলেন; অথবা মহাভারতকার যদি এই দেখাইতেন যে, পাণ্ডবগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইয়া রহিলেন এবং দুর্য্যোধন চিরদিন রাজলক্ষ্মী ভোগ করিয়া গেলেন, তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থদ্বয় ভারতবাসীর এত আদরের জিনিষ হইত কি? তাহা হইলে কাব্যাংশে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কি কোনও দোষস্পর্শ হইত? তাহা হইত না। কারণ তাহা হইলে প্রতিদিন জগতে যাহা ঘটিতেছে, তাহারই অনুরূপ বর্ণনা হইত। যে উপন্যাস মানবপ্রকৃতিকে ও মানবসমাজকে যথাযথ চিত্রিত করে, তাহারই ত প্রশংসা হয়। সে ভাবে উক্ত গ্রন্থদ্বয়, হয় ত তখনও প্রশংসনীয় হইত; কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, তাহা হইলে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের দিকে ফিরিয়াও চাহিতাম না; তাহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া আদর করিতাম না; তাহারা কোন্ দিন বিস্মৃতিজলে ডুবিয়া যাইত। উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে আমরা এত কাল ধরিয়া এই জন্য ভালবাসিতেছি যে, উহারা আমাদিগকে সাহস করিয়া বলিয়াছে, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" তবে ত দেখিতেছি আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যে জন্য আমরা শুনিতে ভালবাসি—"যতো ধর্ম্মস্ততো

জয়ঃ।” এ কথা যিনি বলেন, তিনি আমাদের হৃদয়কে অধিকার করেন,—তিনি আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন,—তিনি আমাদিগকে আপনার করিয়া লন।

মানবমনের উপরে জগতের মহাজনদিগের, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধুদিগের যে এত প্রভাব, তাহার মূলে কি? জগতের দিকে চাহিয়া বল, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্যপ্রভৃতির প্রজাসংখ্যা অধিক, কি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও রুষিয়ার সম্রাটের প্রজাসংখ্যা অধিক? এক রাজ্য মানবের প্রাণের উপর, অপর রাজ্য পৃথিবীর ভূমির উপর, কোন্ রাজ্যের ভিত্তি গভীর স্থানে নিহিত? সিকন্দার, সিজার, নেপোলিয়ানপ্রভৃতি পৃথিবীকে জয় করিতে এবং স্বীয় স্বীয় সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই! কিন্তু দুই সহস্র বৎসর হইল, জুডিয়া দেশের এক অশ্বশালাতে এক সূত্রধরতনয় জন্মিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; এখনও জগতের কত কত রাজার মণিমণ্ডিত মুকুট ঐ সূত্রধরতনয়ের চরণের উদ্দেশে লুণ্ঠিত হইতেছে! এই সকল সাধুগণের এত প্রভাবের মূল কারণ কোথায়? আরও গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আরও বিস্মিত হইতে হইবে যে, সিকন্দর সীজার বা নেপোলিয়ান অনুযাত্রিক সৈন্যদল সংগ্রহ করিবার সময় তাহাদিগকে কত পার্থিব প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন—নূতন নূতন দেশ দেখিবে; লুট তরাজ করিতে পারিবে; সমরশ্রী তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে; গৌরব, সম্মান, বিভব লাভ করিয়া দেশে ফিরিতে পারিবে! এত প্রলোভনসত্ত্বেও তাঁহারা আবশ্যকমত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; বরং সময়ে সময়ে সংগ্রহীত সৈন্যদিগকে স্বীয় বশে রাখিতে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু মানবের এই ঈশ্বরনিযুক্ত গুরুগণ শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন,—যদি আমাদের অনুবর্ত্তী হইতে চাও,

দারিদ্র্যকে বরণ কর, নির্য্যাতনকে বরণ কর, নির্য্যাতনকে মস্তকের ভূষণ কর, আহত ও হত হইবার জন্য প্রস্তুত হও। তথাচ লক্ষ লক্ষ লোক সেই পথানুবর্ত্তী হইয়াছে! কি আশ্চর্য্য! স্বার্থ অপেক্ষা স্বার্থনাশের, সুখ অপেক্ষা দুঃখের, সম্পদ্ অপেক্ষা দারিদ্র্যের আকর্ষণ অধিক! ইহার ভিতরের কারণ কি? মহাজনদিগের কোন্ কথা শুনিয়া লোকে ভুলিয়াছে? কি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছে? সে কথাটাও এই কথা,—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। যখন মানুষ চারিদিকে অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, পাপতাপের সহিত সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সাধুরা তাহাদের কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন, "ভয় নাই—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!" আশান্বিত হও, তোমরা মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, ভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত যে যেখানে আছ, আমাদের নিকটে আগমন কর, আমরা তোমাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি দিব।" আমি জিজ্ঞাসা করি, হে পৃথিবীর ক্লান্ত জীব মানব! হে পাপপ্রবৃত্তির ক্রীড়ার পুতুল মানব! আজ যদি তোমার কর্ণে সুগম্ভীর নাদে এরূপ তূরীর ধ্বনি আসে, তুমি কি স্থির থাকিতে পার?

তবে আর এক দিক্ দিয়াও দেখিতেছি, মানব প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহা ধর্ম্মের জয় দেখিতে চায়,—ধর্ম্মের জয় হইবে, ইহা শুনিতেও ভালবাসে, ভাবিতেও ভালবাসে; এরূপ কথা যে সাহস করিয়া বলে ও সেই বিশ্বাসে আপনাকে অর্পণ করিতে পারে, তাহার চরণে দাস হইতেও ভালবাসে।

ঈশ্বর মানবপ্রতিকে ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছেন। চীন দেশের একজন রাজা একবার মহামতি কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে বিজ্ঞবর! রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষার জন্য কি সময়ে সময়ে দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা আবশ্যক হয় না?" কংফুচ উত্তর করিলেন,—

"হে রাজন্! আপনি হত্যার বিষয়ে চিন্তা করিবেন কেন? আপনি ন্যায় ও ধর্ম্ম-অনুসারে রাজ্য শাসন করুন; দেখিবেন, বায়ুর অগ্রে শস্যক্ষেত্র যেমন স্বভাবতঃ নত হয়, তেমনি আপনার অগ্রে প্রজাকুল স্বভাবতঃ নত হইবে। এ কথার অর্থ এই, মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মের অনুগামী। সকল জ্ঞানী মানুষ ইহা অনুভব করিয়াছেন, সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছেন, সকল গুরুই এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ইমানুয়েল ক্যাণ্ট্ এক স্থানে বলিয়াছেন—দুইটী বিষয় আমাকে গভীর বিস্ময়ে পূর্ণ করে—"নক্ষত্রখচিত আকাশ, ও মানবের হৃদয়নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধি"। ঠিক্! ঠিক্! মানবের হৃদয়নিহিত এই ধর্ম্মানুরাগ আকাশের ন্যায় গভীর ও অপরিসীম।

সৌভ্রাত্র

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।]

[রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ১২৬৮ সালে ২৫শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আশৈশব বিদ্যানুরাগী ও অধ্যয়নপ্রিয়। অতি শৈশবে ইনি রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যানাবলি বিশেষ আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিতেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ ইহাঁর তেমন কিছু হয় নাই। গৃহে পিতার পরিচালকতায় ও নিজ চেষ্টায়ই রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি লেখনী-মুখে সর্ব্বদিগ্‌দর্শিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়া সুধীসমাজের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল সুকবি নহেন, পরন্তু সুগায়ক; চিত্রশিল্পেও ইহাঁর

অভিজ্ঞতা অসাধারণ। ফলতঃ ইহাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার গুণে মুগ্ধ হইয়া আজ সমগ্র ভারতবাসী রবীন্দ্রনাথকে "আমাদের রবীন্দ্রনাথ" বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল হইতেই কবিতারচনায় সিদ্ধহস্ত। ইহাঁর রচিত "গীতা-গুলির ইংরাজী অনুবাদ সুইডেনের সাহিত্যরসামোদী পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টিতে ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত যাবতীয় সাহিত্যপুস্তকমধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ঐ বৎসরের 'নোবেল প্রাইজ' অর্থাৎ নোবেল সাহেবপ্রদত্ত পুরস্কার প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্ত হইয়া ভারতের মুখ প্রসন্ন করিয়াছেন। এবং অধুনা রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীবাসী জনসমূহের উপযোগী "বিশ্বভারতী" গঠনে নিযুক্ত আছেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার রীতিক্রম দেখিবার এবং শিখিবার বিষয়। ইহাঁর ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী মনোহর এবং শক্তি অসাধারণ। ইহাঁর বর্ণনার চমৎকারিত্বে ও উপমাসমাবেশের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইতে হয়। আজকাল রবীন্দ্রনাথের ন্যায় জটিল ভাব সরল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণনা করিতে দ্বিতীয় কেহ নাই। রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভায় মোহিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে 'সার' উপাধি দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহাঁকে "ডক্টর অব্ লিটারেচার" উপাধি দিয়াছেন।

উক্ত প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাস হইতে গৃহীত। সৌভ্রাত্রের এমন সুমনোহর চিত্র বঙ্গভাষায় অতি বিরল।]

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্য দিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন,

এমনি ভাণ করিলেন। রাজা বলিলেন, "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?" নক্ষত্র কাগজের এ পিঠ ও পিঠ উল্টাইয়া হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়—এই, একটু-খানি কাজ ছিল—হাঁ হাঁ, অসুখ হয়েছিল—কতকটা অসুখের মত বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্নমুখে নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যে হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মত লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে মনুষ্যও মনুষ্যকে ভয় করিবে? ভাইও ভায়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পারিবে না? এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই,—এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে! গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মত বোধ হইতে লাগিল। তখন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন, এই স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমার স্বজাতির, আমার ভাইদের মনে কেবল হিংসা, লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি; আমার সিংহাসনের চারিদিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভীষণ কুকুরের মত চারিদিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের খর নখরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের রক্তের তৃষ্ণা মিটাইয়া, এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভাল। প্রভাত-আকাশে

গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমমুখচ্ছবি দেখিয়াছিলেন, তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্নে গোমতীতীরের নির্জ্জন অরণ্যে আমরা দুইজনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন; সেখানে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলা কীটের মত কিল্‌বিল্ করিতেছিল, সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন—দেখিলেন, তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব; সেখানে রোষের লেশমাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনো মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনো সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে—কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে—কিন্তু দুই একটা চিল এখনো আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জ্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। বড় বড় প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দ-টুকু পর্য্যন্তও শোনে, তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত

অন্ধকারের দিকে অনিমিষনেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না, চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল, ভীষণ অদৃষ্টের মত নীরব রাজা এ অন্ধকারে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন, রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন—এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্র-রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পারিলে বাঁচেন; কিন্তু মনে হইল, কে যেন তাঁহার পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মত আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও।" নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল,—রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্ত্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল, ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, বনের মধ্যে একটিও শব্দ নাই—কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্ গম্ করিতে লগিল—সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎ-প্রবাহের মত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে,শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটি যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায় যেন গাছের মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও ?

নক্ষত্র বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না। রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই ?" রাজ্যের লোভে ? তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজচ্ছত্র ? এই মুকুট, এই রাজচ্ছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান ? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি ! রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর, সহস্র লোকের বিপদ্‌কে আপনার বিপদ্ বলিয়া বরণ কর, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন কর,—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারে, সকল লোক ত তাহারই। তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার গৌরব, তাহার সুখ, অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিয়া কাড়িতে পারে না। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা, পৃথিবীর অর্থ ও রক্ত শোষণ যে করে সে ত দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশ বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোন রাজচ্ছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে। অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলঙ্কার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই—পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।"

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। নক্ষত্ররায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই, এখানে লোক নাই; সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায় তাহার স্থান এই, সময় এই,—এখানে কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে, একই পিতা, একই পিতামহের রক্ত—তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও, কিন্তু মানুষের আবাসস্থলে করিও না! যেখানে নিশ্চিন্তমনে পরমস্নেহে ভায়ে ভায়ে গলাগলি করিয়া আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিও না। এই জন্য তোমাকে আজ অরণ্যে আনিয়াছি।"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্র-রায়ের হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই—এ কথা আমার মনে কখনো উদিত হয় নাই—"

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি তাহা জানি। তুমি কি আমাকে কখনো আঘাত করিতে পার!—তোমাকে পাঁচ জনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

কাব্যে উপেক্ষিতা

[প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' হইতে গৃহীত। ঋষি-কবির মহাকাব্যে যিনি উপেক্ষিতা সেই উর্মিলার চিত্র আমাদের মহাকবি প্রাণের তুলিকায় সহানুভূতির বর্ণরাগে কি করুণ, কি সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন! এই প্রবন্ধের

প্রতিবাক্য কি গভীর ভাবপূর্ণ! ইহার প্রতিশব্দ কর্ণে মধু বর্ষণ করে। বস্তুতঃ এরূপ রচনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভবে।]

কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী, ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবিকমণ্ডলু হইতে এক বিন্দু অভিষেক বারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না! হায়, অব্যক্ত-বেদনা দেবী উর্ম্মিলা, তুমি প্রত্যূষের তারার মত মহাকাব্যের সুমেরু-শিখরে একবারমাত্র উদিত হইয়াছিলে, তার পরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না! কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্তশিখরী তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।

উর্ম্মিলাকে আমরা কেবল দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহ-সভায়। তারপর যখন হইতে সেই রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহসভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। উর্ম্মিলা চিরবধূ—নির্ব্বাক্‌কুণ্ঠিতা, নিঃশব্দচারিণী। ভব-ভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হইয়া-ছিল—সীতা কেবল সস্নেহকৌতুকে একটিবারমাত্র তর্জ্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, ইনি কে?" লক্ষ্মণ লজ্জিত-হাস্যে মনে মনে কহিলেন, ওহো উর্ম্মিলার কথা আর্য্যা জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন, তাহার পর রামচন্দ্রের এত বিচিত্র সুখদুঃখচিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটিবারও কাহারও কৌতূহল-অঙ্গুলি এই ছবিটির উপরে পড়িল না। সে ত কেবল বধূ উর্ম্মিলা মাত্র।

তরুণ শুভ্রভালে যেদিন প্রথম সিন্দুরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, উর্ম্মিলা চিরদিনই সেই দিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেকমঙ্গলাচরণের আয়োজনে যেদিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সেদিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণ-মুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরন্তর ব্যস্ত ছিল না? আর যেদিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বিবেশে পথে বাহির হইলেন সে দিন বধূ উর্ম্মিলা রাজহর্ম্ম্যের কোন নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কি কেহ জানে? সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এ বিদীর্য্যমাণ ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল? যে ঋষি-কবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না।

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্ব্বপ্রকারে আত্মবিলোপসাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু সীতার জন্য উর্ম্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, উর্ম্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন। সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে উর্ম্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।

রামায়ণের কতিপয় চরিত্র।

[রাখালদাস চক্রবর্ত্তী।]

[খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগুইডাঙ্গা গ্রামে ইহাঁর জন্ম। ইনি বহুদিন যশোহর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে হেড্ মাষ্টার ছিলেন। ঐ সময়ে বালকগণের চরিত্রোৎকর্ষসাধনার্থে 'নীতি ও চরিত্র' নামে একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উল্লিখিত প্রবন্ধটি উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, মধুর, এবং সরল।]

প্রাচীন কবি বাল্মীকির লেখনী-প্রসূত রামায়ণ ভারতীয় সমস্ত মহাকাব্যের শীর্ষস্থানীয়। ইহাতে যে কেবল ভাষার লালিত্য, বর্ণনার পারিপাট্য ও হৃদয়গ্রাহী ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে এমত নহে; লোকশিক্ষার জন্য যে কিরূপ চরিত্র অঙ্কিত করিতে হয়, অনুকরণের নিমিত্ত যে কিরূপ আদর্শ সম্মুখে ধরিতে হয়, তাহাও এই মহাকাব্যে অতি পরিস্ফুটভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাম, লক্ষ্মণ, জানকী, মারুতি, গুহক, রাবণ ও বিভীষণের চরিত্রবর্ণন এতদূর হৃদয়-গ্রাহী যে, কত যুগ-যুগান্ত চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা কেহই ইহাঁদিগকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; সম্ভবতঃ যতদিন সংস্কৃত ভাষা থাকিবে, ততদিন ইহাঁদের স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না। কি কি কারণবশতঃ যে আমরা উল্লিখিত চরিত্রগুলি বিস্মৃত হইতে পারি না, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

রজনী প্রভাত হইলে রাম রাজসিংহাসনে সমাসীন হইবেন, প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার পূজা করিবে, অমাত্য ও অনুচরবর্গ তাঁহার সেবা করিবে,

স্বর্ণমুকুটে তাঁহার শিরোদেশ পরিশোভিত হইবে, অমূল্য মণিরত্নে তাঁহার দেহের শোভা সংবর্দ্ধন করিবে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অযোধ্যানগরী দ্বিতীয় অমরাবতীর ন্যায় উল্লাসে নৃত্য করিবে; রামের হৃদয়ে কত আশা, কত কল্পনা, কত উৎসাহ! কিন্তু ঘটনাচক্রের অপ্রতিবিধেয় আবর্ত্তনে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। রাজাসন কুশাসনে, হেমমুকুট জটাভারে এবং অমূল্য পরিচ্ছদ চীরবল্কলে পরিণত হইল! সিংহশার্দ্দূলাদি হিংস্র-জন্তু তাঁহার নিত্যসহচর এবং দাক্ষিণাত্যের নিবিড় অরণ্যানী তাঁহার রাজধানী হইল; আশার দীপ নির্ব্বাণ হইল, কল্পনা কল্পনায় মিলিয়া গেল। রাম অকস্মাৎ দারুণ পিতৃ-নিদেশ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু বিচলিত হইলেন না। অম্লানচিত্তে চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাসে কাল যাপন করিতে প্রতি-শ্রুত হইলেন। সামান্য রাজ্য ও ধনে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বীরহৃদয় রামচন্দ্র উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া পিতৃ-আজ্ঞাপালনে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

কোমলহৃদয় রাম জগন্মান্য সূর্য্যবংশের অবতংস। গুহক অনার্য্য-জাতীয় নিষাদ-পতি। আকাশ ও পাতালে যেরূপ প্রভেদ, বংশমর্য্যাদা-সম্বন্ধে এবং সর্ব্বপ্রকার পার্থিব গৌরবে রাম ও গুহকেও তদ্রূপ প্রভেদ। কিন্তু গুণগ্রাহী উদারপ্রকৃতি রাম, গুহকের আন্তরিক আগ্রহ, অকৃত্রিম সরলতা, ও অভূতপূর্ব্ব অতিথিসৎকারে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া, বংশমর্য্যাদার অকিঞ্চিৎকর অভিমান ও অসার গর্ব্ব পরিহারপূর্ব্বক, তাঁহাকে সহৃদয় বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। জাতিনির্ব্বিশেষে সদ্গুণের আদরে ও উদারভাবে অপরের গুণগ্রহণে যে কিরূপ হৃদয়ের প্রশস্ততা প্রদর্শিত হয়, এই গুহকসম্মিলন তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গুহকের কোন প্রকার ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহার একমাত্র বাসনা রামচন্দ্রের প্রীতি-সম্পাদন। গুহক নিষাদজাতীয় ছিলেন বটে,

কিন্তু ঈদৃশ নিষ্কাম মৈত্রীর আদর্শ বোধ হয় আর্য্য রাজবৃন্দের মধ্যেও দুর্ল্লভ।

শরণাপন্নের রক্ষণ রামচরিত্রে উৎকৃষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঘোর শত্রু রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইলে, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবপ্রভৃতি সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু রাম কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, শরণাগত অপরিচিতস্বভাব শত্রুকেও অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। একদা লঙ্কা-সমরে রাবণ, রামের অমানুষিক বলবীর্য্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়া, রণক্ষেত্রে তাঁহাকে ঈশ্বরবোধে স্তব করিতে আরম্ভ করেন। রামও ধনুর্ব্বাণ-পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরানল নির্ব্বাপিত করিয়া, সীতা-উদ্ধারের আশায় জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঈদৃশ শরণাগতরক্ষণের প্রবৃত্তি রামের ন্যায় আদর্শপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর।

বনবাসে একমাত্র সহচর, বিপদে একমাত্র সহায়, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর অনুজ লক্ষ্মণের পরিবর্জ্জনে সত্যপ্রিয় রামচন্দ্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাকালরূপ ব্রহ্মদূত নিভৃতে রামচন্দ্রের সহিত কোনরূপ বিশেষ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে সে স্থলে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। রাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, অধিক কি এইক্ষণ যদি লক্ষ্মণও এস্থলে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকেও অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ উগ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে লক্ষ্মণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত হইতে হইল। সত্যপরায়ণ রাম, অকস্মাৎ লক্ষ্মণের আগমনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত অনুজকেও চিরদিনের মত বিদায় দিয়াছিলেন।

অকৃত্রিম-প্রণয়, সৌভ্রাত্র, গুরুজনের প্রতি যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা;

বিনয়, সত্যপরায়ণতাপ্রভৃতি মনুষ্যের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট গুণ থাকা উচিত, সে সমস্তই মহাকবি বাল্মীকি রামচরিত্রে উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন।

লক্ষ্মণ ভ্রাতৃপ্রেমের সজীব মূর্ত্তি। অগ্রজের উদ্দেশে, তাঁহার মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মণের কিছুই অকর্ত্তব্য ছিল না। লক্ষ্মণ রামময়জীবন। রামের যাহা উদ্দেশ্য, যাহা প্রীতিকর, লক্ষ্মণেরও তাহাই অভীষ্ট, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। দুই দেহের একই প্রাণ, দুই মনের একই ইচ্ছা, চারি চক্ষুর একই দৃষ্টি, চারি কর্ণের একই শ্রুতি, ইহা দেখাইবার জন্যই বোধ হয় লক্ষ্মণের জন্ম। বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে, লক্ষ্মণ ছায়ার ন্যায় রামের অনুসরণ করিয়াছেন। কি বনবাস, কি রাজ্যভোগ, কিছুতেই লক্ষ্মণের স্বার্থ নাই। জ্যেষ্ঠের স্বার্থ,—নিজ স্বার্থ, জ্যেষ্ঠের জন্যই লক্ষ্মণের স্বার্থ উৎসর্গীকৃত। দুর্ব্বাসার কোপে পাছে রামের কোন অনিষ্ট হয়, কেবল এই চিন্তায় আকুল হইয়াই ব্রহ্মদূতের সহিত কথোপকথনকালে লক্ষ্মণ রামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামের অমঙ্গল নিবারণ করিতে তিনি স্বয়ং পরিত্যক্ত হইলেন ও স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এরূপ মধুর অকৃত্রিম ভ্রাতৃবাৎসল্যের মনোহর প্রতিকৃতি অন্য কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ।

ভরত এবং শত্রুঘ্নও রামলক্ষ্মণের চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারাও কখন ভ্রাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই; কিংবা স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জ্যেষ্ঠের স্বার্থের বিঘ্ন করেন নাই; প্রত্যুত লব্ধ রাজ্যপদ তুচ্ছ করিয়া ভরত অগ্রজের পাদুকাসেবায় অধিক গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিরন্তর সাহচর্য্যহেতু লক্ষ্মণের ভ্রাতৃবাৎসল্য যাদৃশী পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, ভরতশত্রুঘ্নের পক্ষে সেরূপ ঘটে নাই। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের ঈদৃশ সদ্ভাব, এরূপ স্বার্থসম্মিলন ছিল বলিয়াই রামরাজত্ব সুশাসনের আদর্শস্থল ও এত গৌরবান্বিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে কি ধনী,

কি নির্ধন, প্রায় সমস্ত পরিবারেই সৌভ্রাত্রের অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং ভ্রাতৃবিরোধে পারিবারিক ও সাংসারিক সুখও প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। রামলক্ষ্মণ যে দেশের সৌভ্রাত্রের আদর্শ, রাজত্বের পরিবর্ত্তে জ্যেষ্ঠের পাদুকা যে দেশে অধিকতর স্পৃহণীয়, সেখানে ভ্রাতৃকলহ যে কতদূর অধঃপতনের পরিচায়ক তাহা চিন্তা ও বর্ণনার অতীত।

জনকতনয়া ভারতবর্ষীয় মহিলাদিগের পতিপরায়ণতার অতীব উচ্চ আদর্শ। ভারতীয় মহিলাগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে পতিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করিয়া আসিতেছেন। কি রাজমহিষী, কি উটজ-বাসিনী, সকলের পক্ষেই পতি সমস্ত মঙ্গলের নিধান। ভারতমহিলার শিক্ষা এইরূপ। কবি সীতাচরিত্রে এই পাতিব্রত্যধর্ম্মের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পতি পত্নীকে ক্রীতদাসী বলিয়া মনে করিতেন না, পতি পত্নীকে নিজের তুল্য বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সমস্ত ধর্ম্মবিহিত কার্য্যে ও ধর্ম্মজীবনলাভে পত্নী পতির সহযোগিনী ছিলেন। কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই পত্নীবিরহিত ছিল না, তাই পত্নীর অপর নাম সহধর্ম্মিণী।

রাম বনবাসে যাত্রা করিলেন, পতিপ্রাণা জানকীও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। শ্বশ্রূ, পুরবাসী আত্মীয়, বন্ধু, অধিক কি রামচন্দ্র স্বয়ংও তাঁহাকে বনযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই; পতিব্রতা সীতা রামের অদর্শন অপেক্ষা জগতে আর কিছুই কষ্টকর বলিয়া মনে করেন নাই। পতিসঙ্গে বনবাসই তাঁহার স্বর্গভোগ। স্বামিসমভিব্যাহারে শ্বাপদাকীর্ণ গহন কাননই তাঁহার মনোরম বিলাস-ভূমি হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত দশাননকর্ত্তৃক অপহৃতা ও নিগৃহীতা হইয়াও কেবল পতির সহিত পুনর্ম্মিলনাশায় সীতা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং পুনর্ম্মিলনে নিদারুণ সমস্ত ক্লেশই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

আজীবন পাতিব্রত্যধর্ম্মের পরীক্ষার জন্যই যেন সীতার জন্ম হইয়াছিল। বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাম রাজ্যলাভ করিলেন এবং সীতাও রাজমহিষী হইলেন, কিন্তু অলীক সুখস্বপ্নের ন্যায় সীতার রাজ্যসুখ অচিরেই তিরোহিত হইল। রাজ্যের মঙ্গলকামনায় রাম সীতাকে পুনরায় বনবাসী করিলেন। নিষ্কলঙ্ক সাধ্বী মিথ্যাকলঙ্কভাগিনী হইয়া চিরদিনের মত পতিসন্দর্শনে বঞ্চিত হইলেন। এ বারে সীতার বনবাস প্রকৃত বনবাস হইল। তত্ত্বদর্শী মুনিবর বাল্মীকির সান্ত্বনায় মুনিকন্যাদিগের সহবাসে, সীতা কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

পতির ঈদৃশ অচিন্তনীয় আচরণে, সীতা নিরতিশয় মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি পতিধ্যান, পতিজ্ঞান, পতির গুণকীর্ত্তন ব্যতীত তপোবনে জানকীর অন্য কোন তপস্যাই ছিল না। স্বকীয় অদৃষ্টে ধিক্কারপ্রদানপূর্ব্বক পতির মঙ্গলকামনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে লবকুশের সঙ্গীতে রামের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল বটে, কিন্তু হতভাগিনীর ভাগ্য আর প্রসন্ন হইল না! দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিকর্ত্তৃক পুনর্গ্রহণের আশা আর থাকিল না! হতভাগিনী চিরজীবন দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ এতাদৃশ বিড়ম্বিত হইলেও, জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও পতিদেবতা জানকীর হৃদয় হইতে পতিভক্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই।

রামচন্দ্রের অনুচরবর্গের মধ্যে প্রভুসেবায় মারুতিই অগ্রগণ্য, এবং তদীয় প্রভুভক্তিও অতুলনীয়। যেদিন সীতার উদ্ধারসাধনে মারুতি নিয়োজিত হইলেন, সেই দিন হইতেই রামের কার্য্যে আত্মোৎসর্গই তদীয় জীবনের মহাব্রত হইয়াছিল, যে কার্য্যে অন্যে পরাঙ্মুখ, সেই কার্য্যেই মারুতি অগ্রসর। যাহাতে নির্ভীকতা ও বীরত্ব প্রকাশ করিলে প্রভুর

অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তাহাতেই হনুমান্ সাহসী ও বদ্ধপরিকর। হনুমানের হৃদয় প্রভুর নিন্দাবাদে শেলবিদ্ধ এবং তাঁহার সুযশঃ ও মহিমা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইত। প্রভুর ইষ্টে হনুমানের ইষ্ট, তাঁহার সুখে হনুমান্ উল্লসিত, তাঁহার বিপদে হনুমান্ অত্যন্ত ব্যাকুল। রামনাম হনুমানের ইষ্টমন্ত্র, রামরূপ হনুমানের নিকট ভগবানের বিশ্বরূপ; রামের চরণ-ধূলি হনুমানের চতুর্ব্বর্গ ফলের বিধাতা। প্রভুসেবার জন্য হনুমান্ কখনও কোন পুরস্কার লাভের আশা করেন নাই। প্রভুর সেবা করা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া সতত রামের সেবায় নিরত থাকিতেন। এরূপ নিষ্কাম সেবায় যে অমরত্ব লাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি! এবং এই জন্যই হনুমান্ "অমর" বলিয়া জগতে বিখ্যাত। হনুমান্ সেবকের আদর্শ, রামও আদর্শপ্রভু। ঈদৃশ প্রভু ও সেবকের সম্মিলন হইলে, দুষ্কর কার্য্যেও সিদ্ধিলাভ করা যায়।

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইলে যে কিরূপ মোহ জন্মে, হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং অবশেষে স্বীয় কর্ম্মদোষে সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হয়, রাবণ তাহার প্রকৃত উদাহরণ। রাবণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয়-বিজয়ী, তাই তিনি ত্রিভুবনের একাধিপতি। রাজদ্বারে, অশ্বশালায় ও উপবনে বিজিত দেববৃন্দ ভৃত্যভাবে নিযুক্ত। এমন কি চন্দ্রসূর্য্যও ভয়ে আর অস্তাচলে বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন না। রাজকোষ বহু-মূল্য মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ। উন্নত অট্টালিকা সুপ্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য রক্ষোবাহিনী, রথ-গজ-বাজিরও ইয়ত্তা নাই। শত সহস্র অনুচর, অমাত্য, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি ও কুটুম্বে লঙ্কা পরিপূর্ণ। অকূল সমুদ্র লঙ্কা নগরীর পরিখা। সংক্ষেপতঃ পার্থিব ঐশ্বর্য্য বলিলে যাহা কিছু বোধগম্য হয় সেই সমস্তই লঙ্কায় বিরাজমান। কিন্তু এতাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও রাবণ পরস্বাপহরণ, মাননীয় ব্যক্তির মর্য্যাদালঙ্ঘন, দুর্ব্বলের

পীড়ন, স্ত্রীজাতির অবমানাপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়ায় নিরত। এরূপ পাপ ছিল না, যাহার অনুষ্ঠান হইতে লঙ্কাপতি বিরত ছিলেন; এরূপ কুকর্ম্ম ছিল না, যাহাতে তাঁহার আসক্তি ছিল না। কি দেশে, কি বিদেশে, কি স্বর্গে, কি মর্ত্ত্যে সর্ব্বত্র সকলেই রাবণের পীড়নে উৎপীড়িত। পাপের স্রোতে আর কত দিন ধরণীর বক্ষঃ কলুষিত করিবে? তাই সীতাহরণে রাবণধ্বংসের অঙ্কুর উদ্গত হইল।

রাম রাজ্যহীন বনবাসী, সৈন্যসামন্তবিরহিত; রাবণের প্রচণ্ড প্রতাপ, ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, তাহাতে আবার তদীয় রাজভবন দুর্ল্লঙ্ঘ্য সাগরে বেষ্টিত। তাঁহার সম্পদের তুলনায় বনবাসী রামের সম্পদ্ কিছুই নয় বলিলেই হয়। কিন্তু কি উপায়ে ভগবান্ পাপের শাস্তি বিধান করেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। বিশাল বারিধিও রামের গতিরোধ করিতে পারিল না। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎপ্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ বীরবৃন্দ সমরে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন এবং অবশেষে রামের হস্তে ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণও সমূলে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। সোনার লঙ্কা ছারখার হইয়া গেল; পাপের ক্ষণিক চাকচিক্য তিরোহিত হইল। রাবণের জীবন হইতে কবি দেখাইলেন যে, যাহার ধর্ম্মবল নাই, তাদৃশ চরিত্রহীন লঙ্কেশ্বরকেও তৃণের ন্যায় অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়।

সাধুসংসর্গে যে কিরূপে আত্মরক্ষা করা যায়, ধার্ম্মিক বিভীষণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তিনি কখন রাবণের কুক্রিয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সীতাহরণব্যাপার হইতে অগ্রজ রাবণকে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য সৎপরামর্শ দিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; যখন দেখিলেন যে, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার পাপাচরণানু-জীবিগণ অন্ধের ন্যায় অজ্ঞাতসারে বিনাশের পথে ধাবিত হইতেছে এবং তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আর উপায় নাই, তখন ভগ্নহৃদয়ে

ও শোকাকুলচিত্তে তিনি মহাপুরুষ রামচন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। রাবণের সংসর্গে আর কিছুদিন থাকিলে, হয় ত তাঁহাকেও সংসর্গদোষের বিষময় পরিণাম ভোগ করিতে হইত। ধর্ম্মবীর বিভীষণ একমাত্র ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগনিবন্ধনই সোদর এবং স্বজাতিদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং সেই অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগহেতুই তিনি আজ জগতে চিরস্মরণীয়।

বিনয়ের অবতার।

(লালা বাবু।)

[জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।]

[জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস,—মাতৃভাষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ইঁহার 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', অদম্য অধ্যবসায়ের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইঁহার 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'—স্বজাতিপ্রীতির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জ্ঞানেন্দ্র বাবু 'চরিত্রগঠন' ও 'ঋদ্ধি' নামে আরও দুইখানি মনোহর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়া 'চরিত্রগঠনে' আমাদের বালকগণের চরিত্রগঠনের জন্য যথেষ্ট উৎকৃষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। 'বিনয়ের অবতার' প্রবন্ধটি চরিত্রগঠন হইতে সঙ্কলিত। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর ভাষা বেশ সরল, সতেজ, সদ্ভাবময়, সমুন্নত চিন্তায় আদ্যন্ত পরিপূর্ণ।]

যিনি ধন পরিজন বন্ধু বান্ধবপ্রভৃতিপরিবৃত, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত, যাঁহার ইঙ্গিতে শত শত লোক আজ্ঞাপালনে রত হয়, যিনি ইচ্ছা করিলে দুর্ল্লভ সামগ্রীও হেলায় সংগৃহীত হয়, যাঁহার বন্ধুত্বলাভের

জন্য লক্ষপতিও বাসনা করেন, শত শত নরনারী যাঁহার প্রসাদে পরিপালিত হইতেছে, এমন অতুল সম্পদের অধিকারীকে কখনও বিনয়বশে কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে দেখিয়াছ? কেমন করিয়া দেখিবে? এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে শত্রুর নিকট যিনি বিনয়ে অবনত হইয়া ঘোর বৈরীকেও পরম মিত্র করিয়া লয়েন, বল দেখি, তাঁহার সেই অহঙ্কারশূন্যতা, তাঁহার দৈন্য কত মনোহর, কিরূপ অপার্থিব আনন্দদায়ক? এইরূপ মহাপুরুষ তোমাদের জন্মভূমিতে তোমাদিগের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম শুনেন নাই বঙ্গে এমন অল্প লোকই আছেন। বিনয়ের অবতার সেই মহাপুরুষের প্রাতঃস্মরণীয় নাম লালা বাবু। ইহাঁর আশ্চর্য্য বৈরাগ্য, অসাধারণ বিনয় ও দৈন্য এবং অসীম দানশীলতাপ্রভৃতি গুণগ্রাম চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখে লালাবাবুর প্রশংসা। লালাবাবু আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দীনহীনের ন্যায় পরমার্থ চিন্তা করিতেছেন। লালাবাবু দুর্ভিক্ষপীড়িত দীন দুঃখী অনাথ অনাথাগণকে অকাতরে অন্নবস্ত্র দিতেছেন; লালাবাবু বৃন্দাবনে অন্নসত্র করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণরায়জীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, গৃহের বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে লালাবাবুর স্তুতিগান বঙ্গদেশ পূর্ণ করিল। বিনয়ীর কর্ণে আত্মপ্রশংসা শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল। যিনি গর্ব্বকে চরণের তলে দমন করিয়া বিনয় ও দৈন্যকে মস্তকের মণি করিয়াছেন, যিনি সংসারের ধনসম্পদ্ পরোপকারব্রতে নিয়োগ করিয়া আপনাকে ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়াছেন, আত্মনিন্দায় তিনি আপনাকে উপকৃত মনে করিয়া ত্রুটিসংশোধনে যত্নশীল হন। কিন্তু আত্মপ্রশংসায় ম্রিয়মাণ হন, এবং অপরাধীর ন্যায় একান্ত সঙ্কোচভাব ধারণ করেন। আত্ম-

প্রশংসা লালাবাবুর হৃদয়ে মহা অশান্তি উৎপাদন করিল। তিনি অগত্যা বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া স্তুতি প্রশংসা এড়াইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। লালাবাবু যে প্রকৃতই বিনয়ের অবতার ছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঘটনা হইতে বেশ জানা যায়। বৃন্দাবনযাত্রিগণ, পুলীন বা বাসস্থলীনামক স্থানের পূর্ব্বদিকে যে অপূর্ব্ব দেবালয় ও কৃষ্ণরায়জীর সেবা দেখিতে পান তাহা ঐ লালাবাবুর কীর্ত্তি। লালাবাবু ঐ মন্দিরে বাস এবং যৎসামান্য প্রসাদ ভোজন করত দিবারাত্রি হরিনাম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। তখনও তাঁহার মন্ত্রগ্রহণ হয় নাই। সেই সময় ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞ সাধু কৃষ্ণদাস বাবাজী বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। ইনিই বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের অপূর্ব্ব জীবনী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। কৃষ্ণদাস বাবাজীর সাধুতা, তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য, অহঙ্কারশূন্যতা এবং অসামান্য ভগবদ্ভক্তির কথা লালাবাবুর শুনিতে বাকী রহিল না। তিনি বাবাজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ইতি-পূর্ব্বে লালাবাবুর পূর্ব্বাবস্থা, তাঁহার বৈরাগ্য, দয়া ও বিনয়াদি গুণগ্রাম কৃষ্ণদাস বাবাজীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনিও লালাবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। গুণীই গুণের মর্য্যাদা জানেন, এক দিবস লালাবাবু বাবাজীর আশ্রমে গমন করিয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। এইবার গুরুশিষ্যের পরীক্ষা। উভয়ই উভয়ের বিষয় এক প্রকার অবগত আছেন। অথচ এই প্রথম আলাপ। সাধুগণের চরিত্র অতীব বিচিত্র। এরূপ ভুবনবিখ্যাত সংসারবিরক্ত ভগবদ্ভক্ত শিষ্য পাইলে কি কেহ বিলম্ব করেন? কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা করিয়া অতি দীন ও করুণ বচনে কহিলেন, বাবা তোমার দীক্ষাগ্রহণে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আরও কিছু দিন বিলম্ব কর।" লালাবাবু বাবাজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। যাঁহাদিগের

চরিত্র এখনও গঠিত হয় নাই, অহঙ্কার ও অভিমানকে যাঁহারা এখনও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই; তাঁহারা এ অবস্থায় কি করিবেন? কৃষ্ণদাস বাবাজীকে নির্ম্মম, গর্ব্বিত, পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিয়া অন্য গুরুগ্রহণে অগ্রসর হইতেন। কি কারণে বাবাজী এরূপ কহিলেন তাহার তত্ত্বানু-সন্ধান করিতেন না। কিন্তু লালাবাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আপনারই ত্রুটি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, "আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছি। নিজের ঠাকুরবাড়ীতে একমুষ্টি প্রসাদ ভোজন করিয়া অষ্ট প্রহর হরিনাম করিতেছি। বাবাজী কহিলেন, আমার এখনও দীক্ষার বিলম্ব আছে, আমার কি দুর্ভাগ্য!" অনন্তর চিন্তা ও চরিত্রানুশীলন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিয়াছি, যথার্থই আমার দীক্ষাগ্রহণে বিলম্ব আছে। ভগবদ্ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক, হৃদয়ের প্রধান মালিন্য অহঙ্কার এখনও আমার সমস্ত হৃদয়ে জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার ঠাকুর বাড়ী, আমার ব্যয়সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি; ইত্যাদি—'আমার' এই জ্ঞানই ত যায় নাই, আমাকে ধিক্!" লালাবাবু সেই মুহূর্ত্ত হইতে মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করত কুঞ্জে কুঞ্জে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া দিনান্তে তাহাই ভোজন করিতে লাগিলেন। হৃদয় হইতে তখন 'অহং-' বুদ্ধি একেবারে চলিয়া গেল, 'আমার' বিষয় 'আমার' ঠাকুর বাড়ী ইত্যাদি ভাব যখন আর উদয় হয় না দেখিলেন, তখন এক দিবস ধীরে ধীরে বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে দীননয়ন অর্পণ করিয়া অধোবদনে আপনার অভিপ্রায় পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন। এবার ভাবিয়াছিলেন, বাবাজী তাঁহাকে নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। বাবাজী তাঁহার অধিক সমাদর করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মধুর বচনে কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষাগ্রহণে এখনও একটু বিলম্ব আছে।" লালাবাবু

স্তম্ভিত হইলেন। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বাবাজীর কুটীরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কি দোষে মন্ত্রগ্রহণে এখনও তিনি অযোগ্য কোন মতে স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একটী একটী করিয়া স্বীয় অপরাধ অন্বেষণ করিতে করিতে ভাবিলেন, আমি স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ্, সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি; মাধুকরীব্রত ধারণ করিয়া দিনপাত করিতেছি, হরিপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অষ্ট প্রহর ভগবানের নাম লইতেছি বটে, কিন্তু আমার মনের মলিনতা ত এখনও দূর হয় নাই! কৈ, শেঠ বাবুদের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে ত যাইতে পারি নাই! এখনও ত শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবুদ্ধি বেশ প্রবল রহিয়াছে, তবে আর আমার মন বিশুদ্ধ হইল কৈ? শত্রু মিত্র, মান অপমান, ভেদজ্ঞান এত প্রবল থাকিতে অহঙ্কারবুদ্ধি কি প্রকারে যাইবে? এই গুণে আমি বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী হইতে গিয়াছিলাম! ধন্য বাবা কৃষ্ণদাস, ধন্য তোমার মহিমা! তোমার মহিমার অন্ত নাই, তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ!”

যে শেঠ বাবুদের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, তাঁহারা জয়পুরের মহাধনী জমিদার এবং মহাভক্ত; বৃন্দাবনে তাঁহাদের প্রকাণ্ড ঠাকুর বাড়ী ও সেবা আছে। ইহাঁদের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই। মথুরা এবং সন্নিহিত স্থানে কয়েকখানি জমিদারী আছে; লালাবাবুর মথুরায় কিছু ভূসম্পত্তি আছে; তাহাতে লক্ষাধিক মুদ্রা আয় হয়। এই জমিদারী লইয়া শেঠ বাবুদের সহিত তাঁহার বহুকাল হইতে বিবাদ বিসংবাদ চলিতে-ছিল। পরস্পর পরস্পরের মুখ দর্শন করিতেন না। এই সূত্রে এরূপ ঘোর শত্রুতা জন্মে যে, উভয়ের জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছিল।

লালাবাবু সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, কিন্তু শেঠ বাবুদের বাড়ীতে যাইতে তাঁহার পা উঠিত না ; মনে হইলে মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদের বাড়ী গিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে—কি ভয়ানক কথা! লালাবাবু যখনই তাঁহার ত্রুটি লক্ষ্য করিলেন, তখনই তাঁহার মান, অভিমান, শত্রুতা, অহঙ্কার পলায়ন করিল। তিনি পর দিবস মধ্যাহ্ন-কালে যমুনায় স্নান করিয়া অতি দীন বেশে শেঠবাবুদের কুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কাঁদিয়া ফেলিল। পাছে প্রভুগণ বিরক্ত হন এই ভয়ে তাহারা কিছু বলিতে পারিল না, বিনা অনুমতিতে ভিক্ষাও দিতে পারিতেছিল না। দৈবক্রমে শেঠবাবুদের কর্ত্তা ঠাকুর-বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন সত্য সত্যই লালা-বাবু উপস্থিত! তাঁহার দীন বেশ এবং বৈরাগ্য দেখিয়া লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিতেই তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি লালাবাবুর চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু শেঠজীকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয়েই প্রেমাশ্রুতে ভাসমান হইলেন। শেঠজী তাঁহাকে প্রসাদ ভোজন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু লালাবাবু তাঁহার মাধুকরীব্রত পণ্ড করিতে কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না এবং অতীব বিনীত বচনে মুষ্টি ভিক্ষাই প্রার্থনা করিলেন।

শেঠজী অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে আদেশ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্যাকুল চিত্তে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবুর এই দৈন্য ও বিনয়-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তিনি ঘোর শত্রুকে মিত্র করিয়া ভিক্ষা লইয়া যখন ঠাকুরবাড়ীর বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখেন সম্মুখে

কৃষ্ণদাস বাবাজী! লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। বাবাজী পরম যত্নে উঠাইয়া লালাবাবুকে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ বচনে কহিলেন, "বাবা তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র।

[৺চন্দ্রনাথ বসু।]

[চন্দ্রনাথ বসু—১২৫১ সালে হুগলী-হরিপাল থানার অধীন কৈকালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় চন্দ্রনাথ প্রথম এবং প্রসিদ্ধ রাসবিহারী ঘোষ ও অধ্যাপক ব্লকমান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে চন্দ্রনাথ এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর বি-এল্ পরীক্ষায় চন্দ্রনাথ দ্বিতীয় এবং রাস-বিহারী প্রথম হইয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ উকিল হন নাই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াও স্বেচ্ছায় সে পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হন এবং ৭ বৎসর কয়েক মাস এই পদে থাকিয়া বিস্তর বাঙ্গালা পুস্তক যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন। অনন্তর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনু-বাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং উক্ত পদে থাকিতেই অবসর গ্রহণ করেন।

চন্দ্রনাথ আশৈশব মাতৃভাষার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু প্রথমে বাঙ্গালা রচনায় সাহসী হন নাই। একদিন বঙ্কিম বাবু চন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,- "তুমি পরীক্ষায় ব্লকমান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে, কিন্তু ব্লকমান আইন আকবরীর ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন, তুমি কি কাজ করিলে?" বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ উত্তেজনায় চন্দ্রনাথ বাঙ্গালা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এক এক করিয়া "শকুন্তলা', 'ত্রিধারা', 'পশুপতি-সংবাদ" 'সাবিত্রী-তত্ত্ব' 'ফুল ও ফল' 'সংযম-শিক্ষা' প্রভৃতি অনেকগুলি তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। চন্দ্রনাথ তাঁহার সরল ভাষা, গভীর

ভাব ও প্রাণের প্রগাঢ় আবেগের ভিতর দিয়া আপনাকে বেশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।]

যখন স্কুল কলেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গলাই তখন আমাদের "দ্বিতীয় ভাষা" ছিল। তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরেজিওয়ালারা উহা অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে, যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যখন ঐরূপ আদর, তখন বঙ্কিম বাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজি ধরণের এক খানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি! এত ইংরাজি পড়িয়া বাঙ্গালায় বহি লেখা কেন! কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কিছু ভাবি নাই। মনে বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথম বারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দিন কতক পরে শুনিলাম, বঙ্কিমবাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটি অক্ষর ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য, প্রাণান্ত করিতেছেন, এবং বঙ্কিম বাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল, বুঝি বা বঙ্কিমবাবুর জন্য কাহারও কাহারও গাত্রদাহ আরম্ভ হইয়াছে। তখন "দুর্গেশনন্দিনী" "মৃনালিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" কিনিয়া পড়িলাম। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের "আইভান হো" পড়িয়া

লিখিত। অনেক দিন পরে বঙ্কিম বাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—"'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার আগে 'আইভান হো' পড়ি নাই।" আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমিই হিন্দুপেট্রিয়টে দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলে?" আমি বলিয়াছিলাম, "না, হিন্দু-পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল, তাহা তোমারই কাছে শুনিলাম।" তিনি বলিয়াছিলেন,—"সমালোচনা অন্যথা হয় নাই এবং পড়িয়া মনে হইয়াছিল, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমা-লোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখন আমি 'আইভান হো' পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।"

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার বঙ্গদর্শনের গ্রাহক হইলাম। বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ—মানুষের অভাব। 'বঙ্গদর্শন' বলিয়া দিয়াছিল, বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে,—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে, আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমাকে বলিতেন, "বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।" আমিও প্রাণপণে মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল,—তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল কলিকাতায়

'কালেজ রি-ইউনিয়ন' নামে ইংরেজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কালেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্রেরা বৎসরের একদিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগানবাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা কথোপকথন, আলাপপরিচয়, জলযোগপ্রভৃতি করিতেন। শুনিতাম এরূপ করিলে দশ জনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়া একতাস্থাপনের সুবিধা হয়। এখনও শুনি যে, এইরূপ সম্মিলনাদি হইতে এরূপ সুফল লাভ করা যায়। আমি তখন একথা বিশ্বাস করিতাম না; এখনও করি না। মানুষের মত মানুষ হইলে তাহাদের সম্মিলনে সুফল হইতে পারে, নইলে পারে না। আমরা ত মানুষই নহি। তথাপি ঐ কলেজ রি-ইউনিয়নে যাইতাম, খাইতাম, ওরূপ কিছু মনে করিয়া নয়, যাইতাম,—কৃষ্ণবন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, প্যারীচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কালেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহা-দের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস যে, অনেকেই শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাবসৃষ্টি বা বন্ধুত্ববিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া কেহ যাইতেন না।

আমি দ্বিতীয় 'কালেজ রি-ইউনিয়নের' সহকারী সম্পাদক হইয়া-ছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা সৌরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'মরকত কুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যেরূপ অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেই প্রকারে করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে? শুনিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর এক বার

করমর্দ্দন করিতে পাইব কি? সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই।—আমার হাতের ভিতর আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।

সে দিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরেন্দ্রমোহনের মূর্ত্তিমান্ রাগাদি দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনি আপনার কোন্ উপন্যাস-খানিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন?" ক্ষাণমাত্র চিন্তা না করিয়া কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—'বিষবৃক্ষ'। তখন, বোধহয়, 'চন্দ্রশেখর' পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা সদরদেওয়ানি আদা-লতের প্রসিদ্ধ উকিল ৺কৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়ের উইলসূত্রে হাই-কোর্টে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। উইল বাঙ্গালায় লিখিত এবং উহার একটি বিধানের অর্থ লইয়া বিবাদ। এক পক্ষের ইচ্ছা, বঙ্কিম-বাবু দ্বারা উহার অর্থ করান। বঙ্কিমবাবুকে সম্মত করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হয়। বঙ্কিমবাবুর পিতৃবন্ধু, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী সরিষাগ্রামনিবাসী এবং ইদানীং কলিকাতার ঝামাপুকুর-নিবাসী ৺রামকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আমার ভ্রাতা দুর্গারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। তিনি তখন হুগলীর অন্যতম ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট, কাছারী করিতেছিলেন। শামলা মাথায় দিয়া গিয়া-ছিলাম, কারণ আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম।

আমাদিগকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন না—উকিল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কোন মোকর্দ্দমায় আসিয়াছেন'? আমি বলিলাম, 'আমরা কোন মোকর্দ্দমায় আসি নাই, আমার নাম——'। 'চন্দ্রবাবু'!—এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাসমাদরপূর্ব্বক আমাদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিলেন। কিন্তু নিজে এমন কষ্টকর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে একটি সুখকর অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করাইলেন—রবিবার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া আহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর।

সকলেই এখন জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ী জেলা ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার কাঁটালপাড়া গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমনকালে অনেকে সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরণের, কতক নব্য ধরণের অট্টালিকা। ঐ রেলপথের পূর্ব্বদিক্ নৈহাটী ষ্টেশন হইতে ঐ ষ্টেশনের দক্ষিণদিক্স্থিত প্রথম ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সদর বাড়ীতে বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম ও আমি বেলা ৯টার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে সমস্ত শ্রোতৃবর্গের মাথার উপরে আপন মস্তক প্রায় অর্দ্ধ হস্ত উত্তোলিত করিয়া এক দীর্ঘকায় বিশালবপু বলিষ্ঠ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন, উনিই বঙ্কিমবাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর,. আমার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, বঙ্কিমবাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি—সকলেই যেন এইভাবে বিভোর—"আমাদের পিতা অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্বস্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

প্রাঙ্গণ বা পূজার দালানে বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে না পাইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? ভৃত্য বাহিরের একটি ক্ষুদ্র ঘর দেখাইয়া দিল। গৃহটি একতালা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিমবাবুর নিজের বৈঠকখানা— সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম অপরিমেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য ঐ গৃহটি বঙ্কিম-বাবুর বড় প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবীদিগের পীঠস্থান হইয়াছে। পীঠস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ জানি না। অনেক দিন তথায় যাই নাই। বড় আশা আছে, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম দৌহিত্র দিব্যেন্দু-সুন্দরের পরম স্থান হইবে।

ঐ ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনারা যে সত্য সত্যই আসিয়াছেন! আমি মনে করিয়াছিলাম, আসিবেন না! রবিবার উকিলদের বাড়ীতে মক্কেলের ভিড় লাগে। মক্কেল পাইলে আপনাদের ত আর কিছুই মনে থাকে না।" কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছিলাম। একবারের কথা বলি।

বঙ্কিমবাবু যে সময়ে কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া হুগলীতে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঢাকায় যাই। তিনি কিন্তু আমাকে বলিয়াছিলেন—"যাইতেছ যাও, কিন্তু ও কাজে থাকিতে পারিবে না।" আমিও ছয়মাস ডিপুটীগিরি করিয়া উহাতে ইস্তফা দিয়া আসি। তাহার দিন কতক পরে বঙ্কিমবাবু হুগলীতে বাস করেন। দুইটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। যোড়াঘাটের

ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বের বাড়ী তাঁহার বৈঠকখানা এবং বৈঠকখানার দক্ষিণে দুইখানি বাড়ীর পর একটি বাড়ী তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর-বাড়ীর পূর্ব্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত, উহার নীচ দিয়া গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত হইত। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু একদিন বলিয়া ছিলেন—"সন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি, বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনার গুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈঠকখানা বাড়ীতে তিনটি ঘর ছিল, তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকে একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ইজি চেয়ারে বসিতেন, কথা কহিতেন আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না। আমি প্রায় প্রতি শনিবার সেখানে যাইতাম। কোন শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। আমি প্রায়ই নৈহাটি দিয়া যাইতাম। নৌকায় আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র ঘাটের নিকটে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন। একবারে ঘাটে নৌকা পৌঁছিবা-মাত্র আমি নামিলাম না দেখিয়া বলিলেন,—"এস"। আমি বলিলাম,—"যাব কি না তাই ভাবছি।" যাইবামাত্র হাসি আলিঙ্গন। সে কথা আর কি বলিব!

বঙ্কিমবাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন তাঁহার কাছে কখনই খাই নাই। যখনই গিয়াছি দুই এক দণ্ড পরে নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখনই আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম, এ সব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়? শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়—আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র। আমি ত অনেকবার গিয়া অনেক দেখিয়া-ছিলাম। আমার ঋষিতুল্য বন্ধু রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র

বিদ্যারত্ন, একবারমাত্র আমার সঙ্গে গিয়া বলিয়াছিলেন,—"বাঃ" বঙ্কিম বাবু কি বন্ধুবৎসল!" একবার সন্ধ্যার কিছু পরে পৌঁছিয়া শুনিলাম তাঁহার জ্বর হইয়াছে—তিনি অন্দরে শুইয়া আছেন। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র উঠিয়া আসিলেন; আসিয়া নানা কথা কহিলেন। আমি যতক্ষণ আহার করিলাম, ততক্ষণ আমার কাছে উপবিষ্ট রহিলেন—যেন কোন অসুখ হয় নাই, যেন দেহে ও মনে স্ফূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বঙ্কিমবাবু সাহিত্যানুরাগীদিগের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন—আলাপ করিলে ভাল থাকিতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ তাঁহার যেন প্রাণবায়ু ছিল। সে সংসর্গ না পাইলে তাঁহার প্রাণ যেন ফুলিয়া উঠিত। যেবার হেমচন্দ্রকে লইয়া যাই, সেবার গিয়া দেখি, মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। শীতকাল সন্ধ্যা আগতপ্রায়। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুলরূপ সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, কমনীয়তামিশ্রিত অসীম প্রতাপ ও পুরুষকারব্যঞ্জক মুখগৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন অন্তরে কি আনন্দ! হেমচন্দ্র উপস্থিত—অগ্রে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আরম্ভ হইল; সেই কথা হইতে আরও কত কথা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্রে কি স্ফূর্ত্তি! স্ফূর্ত্তিতে এই কথা ফুটিতে লাগিল—ইহাই ত সুখ, ইহাই ত জীবন,—এই রকমই ত চাই।

সাহিত্যের সংস্রবমাত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সুখী হইতেন। এক শনিবার আফিস হইতে বেলা তিনটা কি চারিটার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখি, অসুস্থতার জন্য তিনি মেজের উপর শয্যায় শুইয়া আছেন, আর দুইখানা কেদারায় দুইটি যুবক বসিয়া আছেন। একটি যুবককে আমি চিনিতাম। তিনি একখানা ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক লিখিয়া

বঙ্কিম বাবুকে উপহার দিতে গিয়াছিলেন। আমি যাইবার দুই চারি মিনিট পরেই যুবক দুইটি চলিয়া গেলেন। তখন তাহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, —"ইহাঁরা কতক্ষণ ছিলেন ?" তিনি বলিলেন,— দুই তিন ঘণ্টা হইবে। সাহিত্যের সংস্রব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমবাবু অত ছোট বালক দুইটিকে লইয়া অতক্ষণ তেমন স্থির ধীর প্রফুল্লভাবে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, বালকদ্বয় তাঁহার নিকটে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

মাতৃভাষায় লিখিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে তিনি অনেককেই উৎসাহিত করিতেন। আমি কখনও বাঙ্গালা সাহিত্য ঘৃণা করি নাই। তখন চারিদিকে বাঙ্গালা ভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলেও উহা ভাল করিয়া শিখান হইত না। কিন্তু লুকাইয়া বঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম—কাহাকেও দেখাইতাম না। বঙ্কিমবাবু যখন যোড়াঘাটের বাড়ীতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম,—"ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যাস্পদ হইব ?" তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শন প্রেসে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন। বঙ্কিম বাবুর যোড়াঘাটের বাড়ীতে আমি হরপ্রসাদকে প্রথম বন্ধুস্বরূপ পাই। হরপ্রসাদের বাড়ী নৈহাটিতে। তিনি সর্ব্বদাই গঙ্গা পার হইয়া বঙ্কিম বাবুর বাসায় যাইতেন। তাঁহাকে বঙ্কিম বাবুর পরম ভক্ত দেখিতাম, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেন।

আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটির দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি

তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। নানা শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ গম্ভীরপ্রকৃতি, বালকবৎ সরলতাশোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় তাঁহার আরও কয়েকটি বন্ধু বড় অনুরাগভরে আসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কলিকাতায় থাকিলে তিনি, তারাকুমার কবিরত্ন, বঙ্কিমের সহাধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত, কবি হেমচন্দ্র এবং আর সেখানে থাকিতেন —বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম দাদা সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম।

ভরত-মিলন।

[দীনেশচন্দ্র সেন।]

[দীনেশচন্দ্র—১৮৬৬ খৃঃ অব্দে কার্ত্তিক মাসে ঢাকা-মাণিকগঞ্জের অধীন কাজুয়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর রচিত গ্রন্থ—'রেখা', "কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ" (কাব্য), 'সতী', 'বেহুলা', 'গৃহশ্রী', 'রামায়ণী কথা,' 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।' শেষোক্ত গ্রন্থ ইহাঁর অদম্য অধ্যবসায়ের অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। সম্প্রতি ইনি অভিনব ছাঁচে ঢালিয়া মুক্তাচুরি প্রভৃতি কয়েকখানি অতি মধুর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্রের ভাষা সরল, সরস এবং বর্ণনীয় বিষয়ের বিষদীকরণে সুপটু। ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজে বঙ্গভাষায় প্রধান অধ্যাপক।]

শৃঙ্গবের পুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম

একটু জলপান করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃণশয্যা রামের বিশাল বাহু-পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয় বস্ত্র প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, গুহক কথা বলিতেছিলেন, তখন ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ;—রাণীগণ এবং সচিববৃন্দের শোকও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুযত্নে ভরত জ্ঞান লাভ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন,—"এই নাকি তাঁহার শয্যা,—যিনি আকাশ-স্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত,—যাঁহার গৃহ পুষ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত,—যে গৃহশিখর নৃত্যশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও গীত-বাদিত্রশব্দে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাঞ্চনভিত্তিসমূহ কারুকার্য্যের আদর্শ,—সেই গৃহপতি ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া ইঙ্গুদীমূলে পড়িয়া ছিলেন, এ কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য। আমি কোন্ মুখে রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই, আমি আজ জটাবল্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবন যাপন করিব।"

এবার জটাবল্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন। এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। এক রাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মুনির নির্দ্দেশানুসারে রাজ-কুমার চিত্রকূটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন। ভরত এইভাবে মাতা-দিগের পরিচয় দিলেন,—"ভগবন্, ঐ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণ-দেহা, সৌম্যমূর্ত্তি দেবতার ন্যায় দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ

রামচন্দ্রের মাতা, উহাঁর বাহু আশ্রয় করিয়া বিমনা অবস্থায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুষ্কপুষ্প কর্ণিকারতরুর ন্যায় শীর্ণাঙ্গী—ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা, আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা—এই দুর্ভাগ্যের মাতা।" বলিতে বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আম্র ও লোধ্রদল পক্ব হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর। নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্ভারে প্রমোদ-উদ্যানের ন্যায় সুন্দর, কোথাও পর্ব্বতগাত্র হইতে একটিমাত্র শৈলশৃঙ্গ উর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া আছে—অদূরে মন্দাকিনী কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরু-রেখার প্রান্তে বিলীয়মান। তরঙ্গরাজি-সুধৌত শুভ্র বস্ত্রের ন্যায় বায়ু-কর্তৃক ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, কোথাও পার্ব্বত্য ফুলরাশি স্রোতো-বেগে ভাসিয়া যাইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন—রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্‌বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধা জন্মাইতেছে না। আমি এই পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলীর নির্ম্মল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেছি।

এই কথা শেষ হইতে না হইতে সহসা বিপুল শব্দে নভঃপ্রদেশ আকুল হইয়া উঠিল, সৈন্যরেণুতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল শব্দে

পশুপক্ষী চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা, করিলেন, "দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার জন্য এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তুর আগমনে এই সৌম্য-নিকেতনের শান্তি এ'ভাবে বিঘ্নিত হইতেছে?" লক্ষ্মণ দীর্ঘ পুষ্পিত শাল-বৃক্ষের অগ্রে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বদিকে সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন, এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন।" "কাহার সৈন্য আসিতেছে কিছু বুঝিতে পারিলে কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, "অদূরে ঐ যে বিশাল বিটপী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রান্তরে ভরতের কোবিদারচিহ্নিত রথধ্বজ দেখা যাইতেছে—অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হয় নাই, নিষ্কণ্টকে রাজ্যশ্রী লাভ করিবার জন্য ভরত আমাদিগের বধসংকল্পে অগ্রসর হইতেছে, আজ এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব।

রামচন্দ্র বলিলেন, "ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরস্নেহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্নেহাক্রান্তহৃদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই। তুমি তাহার প্রতি কেন ক্রূর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যদি রাজ্যলাভে এরূপ করিয়া থাক, তবে ভরতকে বলিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়াইব!" ধর্ম্মশীল ভ্রাতার এই উক্তি শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অনশনকৃশ ও শোকের জীবন্ত মূর্ত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া

বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন—"হেমচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী-উজ্জ্বল শিরোদেশে জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মার্জ্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি ধূলিধূসর! যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,—আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকবিগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্!" বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মাথায় জটাজূট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন;" বলিলেন,—"বৎস, তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।"

ভরত জ্যেষ্ঠের পদতলে লুটাইয়া বলিলেন,—"আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন। আপান তাঁহাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার ভাই,—আপনার শিষ্য,—দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল;—রাম বলিলেন, "আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইব, প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্ত্তব্য।" কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জটাভার শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুট স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই

পাদুকা অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন, "রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব; সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

অযোধ্যার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দিগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কলপরিহিত ফলমূলাহারী রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন? তাঁহারা সকলে কষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কষায়বস্ত্র-পরিহিত সচিববৃন্দপরিবৃত ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজ-কুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।

ভরতের এই বিষণ্ণ মূর্ত্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। যখন সীতাকে হারাইয়া তিনি উন্মত্তবেশে পম্পাতীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,—এই পম্পাতীরে রমণীয় দৃশ্যাবলী সীতার বিরহে ও ভরতের দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে না।" আর এক দিন লঙ্কায় রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিয়া-ছিলেন, "বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইব?"

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই পাদুকাদ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, তুমি অযোগ্যকরে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর। চতুর্দ্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে।"

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য্য সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, "কোন কোন জলজন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন, "রাম হইতেও ধর্ম্মবলে ইহাকে অধিক বলীয়ান্ জ্ঞান করিও।" কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয়, তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারি—"অযত্নাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ধন্য, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না।"

মধুসূদনের কাব্যানুরাগ ও জন্মভূমির সৌন্দর্য্য।

[যোগীন্দ্রনাথ বসু।]

[যোগীন্দ্রনাথ ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার নিতাড়া গ্রামে ১২৬৪ সালে শ্রাবণ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺নিতাইচাঁদ বসু।

যোগীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনর বৎসর কাল দেওঘর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরে কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর জমিদার মহাশয়ের অভিভাবক ও শিক্ষক নিযুক্ত থাকিয়া এক্ষণে ঠাকুর-ষ্টেট হইতে লব্ধ পেন্‌সন ভোগ করিতেছেন। এ বয়সেও বাণীর আরাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। যোগীন্দ্রনাথ এ যুগের মহাকবি। যাঁহারা বলেন এ গীত-কবিতার যুগ মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে। যোগীন্দ্রনাথের মহাকাব্যযুগল—'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী'—পাঠ করিয়া বোধ হয় তাঁহাদের সে ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। কাব্যের দিন কখনও যায় না. মহাকবি থাকিলে মহাকাব্যও থাকে। যোগীন্দ্রনাথের গদ্যও অতি মনোহর, এ গদ্য কোন লঘু রচনার জন্য নয়,—গভীর গুরু বিষয়বর্ণনার সম্পূর্ণ উপযোগী। অথচ এ গদ্য লঘুগতি, মধুর ন্যায় মধুর, শরদের জাহ্নবীধারার ন্যায় স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও পবিত্র। ইহাঁর রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী' প্রকাশিত হইলে, বঙ্গীয় পাঠক "আহা কি অপূর্ব্ব বস্তু পাইলাম" বলিয়া গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল অমর গ্রন্থ কবিবরকে চিরস্মরণীয় রাখিবে। এতদ্ভিন্ন যোগীন্দ্রনাথ 'তুকারাম রচিত' 'অহল্যা বাঈ 'কবিতাপ্রসঙ্গ' ৩ ভাগ 'পতিব্রতা' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া যশোভাজন হইয়াছেন। যোগী যেমন একাসনে বসিয়া ইষ্টের সাধনায় সুখী, যোগীন্দ্রনাথও তেমনই নির্জ্জনে থাকিয়া সারদার সাধনায় পরিতৃপ্ত। ইহাঁর ভাষা, গদ্য পদ্য উভয়ই দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার, সাধু-হৃদয়ের ন্যায় প্রসাদগুণযুক্ত এবং নির্ভীক নির্ব্বিকার বীরবাণীর ন্যায় ওজোময়ী। উক্ত প্রবন্ধটি ইহাঁর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী" হইতে গৃহীত।]

মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ, তাঁহার কাব্যানুরক্তি। নানাদেশীয় কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি আর কেহ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। তাঁহার জীবনের অন্যান্য অনেক সদ্‌গুণের ন্যায়, তাঁহার এই কাব্যানুরাগও জননীর প্রদত্ত শিক্ষা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে

বিদ্যাশিক্ষার বড় প্রচলন ছিল না। কিন্তু জাহ্নবী দাসী স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য, বিবাহের পর লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহ তিনি অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, পঠিত গ্রন্থের অনেক অংশ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে অনেক কবিতা মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন। মেধাবী মধুসূদন আট দশ বৎসর বয়সের সময়, মাতাকে এবং বাটীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদিগকে এইসকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং মাতার দৃষ্টান্তানুসারে তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। কোন সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়াছেন মনুষ্য মাতৃস্তনদুগ্ধের সঙ্গে যাহা শিক্ষা করে, জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। মধুসূদনের জীবনে একথা অতি সুন্দররূপে প্রমাণিত হইতে পারে। বহু ভাষায় এবং বহু গ্রন্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার ফলে, রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগের কখনও খর্ব্বতা হয় নাই। পূর্ণ বয়সে যখন সংস্কৃত, পার্শী, লাটিন, গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসীস, জর্ম্মাণ ও ইতালীয় পৃথিবীর এই কয়টি প্রধান ভাষার অমৃতভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল, এবং যখন তিনি বাল্মীকি, হোমর, ভার্জ্জিল, দান্তে প্রভৃতির ন্যায় মহাকবিদিগকে সুহৃদ্রূপে প্রাপ্ত হইলেন, তখনও তিনি তাঁহার শৈশবের সহচর দরিদ্র কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাসকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন তিনি একখানি কাশীদাসী মহাভারত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছেন। মধুসূদন বেশভূষা ও আহারব্যবহারে সাহেবের ন্যায় থাকিতেন। তাঁহার আত্মীয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "একি সাহেব লোকের হাতে মহাভারত?"

মধুসূদন হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব আছি বলিয়া কি বইও পড়িতে

দিবে না? রামায়ণ, মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।”

মান্দ্রাজে অবস্থানকালে, যখন চর্চ্চার অভাবে তিনি বাঙ্গালা ভাষা বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, তখনও তিনি কলিকাতা হইতে রামায়ণ মহাভারত আনাইয়া যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কেবল রামায়ণ মহাভারত বলিয়া নয়, বাঙ্গালা ভাষার অনেক প্রাচীন কাব্যই তিনি অতি সমাদরের সহিত পাঠ করিতেন। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি তাঁহার স্বদেশীয় কবিগণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিষ্টাচারের জন্য নয়, তাহা প্রকৃতই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার এবং অনুরাগের ফল।

রামায়ণ এবং মহাভারতপাঠের সহিত মধুসূদনের ভবিষৎ জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যে মহাগ্রন্থদ্বয় শত শত বৎসর অবধি হিন্দু নরনারীদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে, এবং সহস্র সহস্র ভারতসন্তান যাহা হইতে আপন আপন ভাবী মহত্ত্বের বীজ প্রাপ্ত হইতেছেন; সেই মহাগ্রন্থদ্বয় মধুসূনেরও প্রকৃতিদত্ত প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাল্যকালে পুনঃ পুনঃ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার কবিশক্তিবিকাশের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় আরও কত ভারতীয় কবি যে এরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। লোকের বিশ্বাস, কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে, অভীষ্টবর প্রাপ্ত হওয়া যায়; রামায়ণ এবং মহাভারত ভারতসন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। আমাদের জাতীয় জীবন-গঠনের পক্ষে এই দুই গ্রন্থ যেরূপ সহায়তা করিয়াছে, আর কোনও দেশের কোন কাব্য সেরূপ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কত অনুতপ্ত হৃদয় ইহা হইতে শান্তি লাভ করিতেছে; কত শোকজীর্ণ প্রাণ ইহা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত

হইতেছে; কত স্বদেশবৎসল ইহা হইতে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিতেছেন এবং কত ভাবুক পুরুষ ইহা হইতে কবিশক্তি পরিপোষণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা হইতে ঘোর অনুতাপ যন্ত্রণায় মুক্তি পাইয়াছিলেন; শিবাজী ইহা হইতে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিয়াছিলেন; তুলসীদাস ইহা হইতে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতের সহস্র সহস্র কবি ইহা হইতে আপন আপন কবিশক্তিপরিপোষণের উপযুক্ত উপাদান প্রাপ্ত হইতেছেন। মধুসূদনের প্রকৃতিদত্ত কবিশক্তি-বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখের উপযুক্ত, কিন্তু এই রামায়ণ এবং মহাভারতের পাঠসম্বন্ধে বাল্মীকির এবং বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের এবং কাশীদাসেরই নিকট তিনি সমধিক ঋণী ছিলেন। মহর্ষিদ্বয়ের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাঁহার কাব্যসমূহের ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাষাশিক্ষা, বর্ণনানৈপুণ্য এবং পুরণান্তর্গত বিষয়সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপ্রভৃতি অনেক বিষয়, তিনি কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মেঘনাদবধ এবং বীরাঙ্গনার অনেক স্থলেই সেইজন্য ইহাঁদিগের প্রভাব লক্ষিত হয়।

মধুসূদনের কাব্যানুরক্তির অপর কারণ তাঁহার বাল্যশিক্ষা। আট নয় বৎসর বয়সের সময় যে শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন, তিনি পারসীক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও শুনিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীও অল্প অল্প জানিতেন। ছাত্রদিগকে তিনি অনেক পারশ্যভাষার কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতে বলিতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করিতে

পারিতেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে কবিতানুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ-অনুসারে মধুসূদন অল্প বয়সেই অনেক পারসী কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং সমবয়সীদিগকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়ও তিনি পারসী 'গজল' গান করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন। তাঁহার কাব্যা-রক্তির অপর একটি কারণ তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তা। বাল্যকাল হইতে কবিতার ন্যায় গীতবাদ্যের দিকেও প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার পিতা এবং পিতৃব্যগণের ন্যায় তিনিও, আগমনী, বিজয়া প্রভৃতি সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে গলদশ্রু হইতেন। অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহার বারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর, কোন ব্রাহ্মণ, একবার তাঁহার নিকট একটি মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ জানিবার জন্য গিয়াছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল এবং তিনি জানিতেন যে ব্রাহ্মণ অতি সুন্দর "সখী-সংবাদ" গান করিতে পারেন। মধুসূদন মোকদ্দমার কথা রাখিয়া সখী-সংবাদ গাহিবার জন্য ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট ক্রমান্বয়ে দশপনরটি সখী-সংবাদ শুনিবার পর, বিনা অর্থ-গ্রহণে তাঁহার মোকদ্দমায় উপযুক্ত সাহায্য দান করিলেন।

মধুসূদনের সাহিত্যগতজীবন বুঝিতে হইলে, তাঁহার শৈশবসম্বন্ধীয় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক, আমরা একে একে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার খুল্লপিতামহের কবিশক্তি, তাঁহার পিতা পিতৃব্য ও জননীর কাব্যানুরাগ, তাঁহার শিক্ষকের কবিতাপ্রিয়তা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার নিজের রামায়ণ ও মহাভারতপাঠে এবং সঙ্গীতশ্রবণে প্রগাঢ়

আসক্তি ইত্যাদি যে সকল উপাদানে তাঁহার ভবিষ্যৎ গঠিত হইয়াছিল, আমরা একে একে তাহার সকলগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি। কেবল তাঁহার কপোতাক্ষসলিলবিধৌত সৌন্দর্য্যময়ী জন্মভূমির বিষয় উল্লেখ করি নাই। প্রকৃতি আপন নীরব ভাষায় যে শিক্ষা প্রদান করেন, পৃথিবীর নিত্য নবীন মুখশ্রী যে কত অপ্রেমিককে প্রেমিক এবং কত অকবিকে কবি করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই। সেইজন্য মধুসূদনের শৈশবের অন্য অনুকূল উপাদানের ন্যায়, তাঁহার জন্মভূমিরও উল্লেখ করিবার আবশ্যক। প্রকৃতির অতি বিলাসময় নিকেতনে মধুসূদনের শৈশব অতীত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি সাগরদাড়ী অতি সুকোমল গ্রাম্য শোভায় পূর্ণ। নদী, প্রান্তর এবং বৃক্ষলতাপ্রভৃতি যে সকল উপাদান লইয়া বঙ্গের পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য, তাহার কোনটিরই সেখানে অভাব নাই। নির্ম্মলসলিলা কপোতাক্ষী ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী শাখায় শাখায় সম্বদ্ধ হইয়া, স্থানে স্থানে তাহার উপর অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত ভূমি নদীর তট হইতে জলের রেখা পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। নগরের কৃত্রিমতার সঙ্গে সেখানকার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি অতি সরল গ্রাম্য মূর্ত্তিতে সেখানে বিরাজিতা। নদীজলে কুললনাগণ স্নানাবগাহন করিতেছেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাপ্রকারের তরণী-সমূহ নদীবক্ষে গমনাগমন করিতেছে। কৃষকবনিতাগণ কলসীকক্ষে নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টে তাহাদিগের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; রাখালবালকগণ পশুপাল ছাড়িয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতেছে; দেখিলে নগরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, সেই সরল গ্রাম্য সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। কপোতাক্ষীর পশ্চিমদিকে দূরপ্রসারিত শ্যামল প্রান্তর। নদীর উভয় তটে বৃক্ষরাজির অন্তরালে স্থানে স্থানে কৃষকদিগের কুটীর

মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রাচীন বট বা অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ। উদ্যানজ তরুসমূহের ঘনসন্নিবেশে গ্রামটি মধ্যাহ্নকালেও ছায়াপূর্ণ। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর নীরব হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার জন্মভূমির বিহগগণের সঙ্গীতের এখনও বিরাম হয় নাই। পাপিয়ার গগনভেদী কণ্ঠস্বরে এখন তাহা পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত অযত্নসম্ভূত তরু-লতা, উদ্যানজ বৃক্ষরাজির সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গ্রামটিকে আরণ্য শোভায় অলঙ্কৃত করিতেছে। মধুসূদনের পৈতৃক বাসগৃহের অদূরবর্ত্তী নদীতটে দণ্ডায়মান হইয়া, একবার জ্যোৎস্নালোকে পাপীয়ার দিগন্তপ্লাবী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে, নিস্তব্ধ গ্রামটির এবং ধারাবাহিনী কপোতাক্ষীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অতি নীরস হৃদয়ও ভাবে পরিপূর্ণ হয় ; এবং গ্রামটিকে স্কটের ভাষায় "কবিপুত্রের উপযুক্ত ধাত্রী (Meet nurse for a poetic child") বলিতে ইচ্ছা করে। জ্যোৎস্না-লোকে যিনি কপোতাক্ষীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, মধুসূদন যে তাহাকে দুগ্ধস্রোতের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

পিতৃভক্ত জালিম সিংহ।

[নিখিলনাথ রায়]

[নিখিলনাথ রায়—২৪ পরগণা—বসিরহাট মহকুমার পুড়াগ্রামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং নিজে বংশধারা রক্ষা করিয়া শিশুকাল হইতে ইতিহাসানুরাগী। ১২৯১ সালে ইহাঁর ঐতিহাসিক কাব্য 'রাজপুতকুসুম'

প্রকাশিত হয়। পরে ইনি 'অশ্রু-হার' নামে আর একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্ণয়ই ইহাঁর জীবনের প্রধান সাধনা। এবং 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আমরা ইহাঁর সেই সাধনার গৌরবময় সাফল্যের পরিচয় পাইয়াছি। নিখিলনাথের বর্ণনাশক্তিতে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহার ভাষা বেশ সজীব—ইতিহাসের জীর্ণ কঙ্কালে যেন জীবন সঞ্চার করে। 'পিতৃভক্ত জালিম সিংহ' প্রবন্ধটি 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' হইতে গৃহীত।]

বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্যলাভের আশায় আলীবর্দ্দী খাঁ ও সরফরাজ খাঁ ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে গিরিয়া-প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, গিরিয়ার বিশাল প্রান্তর বিধৌত করিয়া প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কল কল নাদে প্রবাহিতা হইতেছেন। তাঁহার উভয় তীরে শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই সকল শিবিরের ধবল ছবি ভাগীরথীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে শত শত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। রাত্রি প্রভাত হইলে, উষার বিমলচ্ছটায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। সমস্ত বিশ্বে যেন সজীবতার প্রবাহ ছুটিয়া চলিল, বিহঙ্গনিচয়ের মধুর ঝঙ্কারে যোদ্ধগণের হৃদয়-তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠিল। সূর্য্যদেব দিগ্বলয় আশ্রয় করিতে না করিতে উভয় পক্ষের সমরবাদ্য নিনাদিত হইল। হস্তীর বৃংহণে, অশ্বগণের হ্রেষারবে, কামানের গভীর গর্জ্জনে, যোদ্ধগণের উৎসাহ-নিনাদে, দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ যখন ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল তখন সরফরাজ নিজে উৎসাহসহকারে হস্তিপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধিকাংশই ভূতলশায়ী হইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় তিনি কাপুরুষতা অবলম্বন না করিয়া নিজেই ভীষণ সমরসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। সহসা একটি বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট

হইল, এবং তিনি বীরের ন্যায় সেই সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে সরফরাজই কেবল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি গওস খাঁ আলীবর্দ্দীর একদল সৈন্য মথিত করিয়া প্রভুর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, পরে প্রভুর মৃত্যুশ্রবণে স্বীয় পুত্রদ্বয় সহ জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইলেন। অদম্য উৎসাহসহকারে আলীবর্দ্দীর সৈন্যসাগর মন্থন করিতে করিতে তিনিও ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার বীরপুত্রদ্বয়ও পিতার পথের অনুসরণ করিলেন।

বিজয় সিংহ নামে একজন রাজপুত বীরের হস্তে নবাব সরফরাজের সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষার ভার ছিল। বিজয় সিংহ গিরিয়ার নিকট খামরা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন তিনি অবগত হইলেন যে, তাঁহার প্রভুর অধিকাংশ সৈন্যাধ্যক্ষ একে একে গিরিয়ার ভীষণ সমরে আপনাদিগের জীবন বলি দিয়াছেন, এবং প্রভু নিজেও হস্তিপৃষ্ঠে চিরদিনের জন্য বিশ্রামলাভ করিতেছেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অতি অল্পসংখ্যক অশ্বারোহীর সহিত আলীবর্দ্দীর দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রভুর মৃত্যুতে রাজপুতের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া এক ভীষণ বল্লম গ্রহণ করিয়া আলীবর্দ্দীকে লক্ষ্য করিলেন, উজ্জ্বল তপনপ্রভায় বল্লম প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আলীবর্দ্দী খাঁর সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ দাওর-কুলীর একটি অব্যর্থ গুলিতে রাজপুতবীর বিজয় সিংহ গিরিয়াপ্রান্তরে শায়িত হইলেন।

বিজয় সিংহের নবমবর্ষীয় পুত্র জালিমসিংহ ছায়ার ন্যায় পিতার অনুবর্ত্তন করিত; কি শিবিরে, কি সমরক্ষেত্রে, কোন স্থানে তাহার

গতির বিরাম ছিল না। যৎকালে বিজয় সিংহ খামরা হইতে গিরিয়া-সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হন, শিশু জালিমও তাঁহার সঙ্গে সেই সমরসাগরের উত্তালতরঙ্গমধ্যে পতিত হয়। বিজয় সিংহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলে বালক নিষ্কোষিত তরবারিহস্তে পিতার মৃতদেহ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইল। চতুর্দ্দিকে আলীবর্দ্দীর সেনাগণ জয়নিনাদ করিতেছে, রণবাদ্যের ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে, নবমবর্ষীয় বালকের ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপনার ক্ষুদ্র তরবারি লইয়া আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, পাছে পিতার মৃতদেহ মুসলমানগণকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় সে আপনার প্রাণকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া ভীষণ সমরসাগরমধ্যে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিল। কি যেন মহীয়সী শক্তি তাহার হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল, বালক তাহার প্রভাবে পিতার মৃতদেহ রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হইল। ক্রমে ক্রমে রাশি রাশি সৈন্য বালককে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তাহারা যেন বালককে পেষণ করিবার উপক্রম করিল। বালক তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া আপনার ক্ষুদ্র তরবারি চালনা করিত লাগিল। তপনালোকে ঝলসিত হইয়া তরবারি নৃত্য করিয়া উঠিল। যতই আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছিল ততই বালকের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে রাজপুতজাতি জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের অভিনয় করিয়াছে, তাহাদের সামান্য রক্তবিন্দুও যে সজীব, ইহা কে অস্বীকার করিবে ?

আলীবর্দ্দী খাঁ নিজে সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অদ্ভুত সাহসে ও পিতৃভক্তিতে চমৎকৃত হইয়া সৈন্যগণকে তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং স্বীয় হিন্দুসৈনিকগণকে বিজয়সিংহের

মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করিতে আদেশ দিলেন। বালক এই আদেশ অবগত হইয়া পিতার দেহস্পর্শে অনুমতি দিল। আলীবর্দ্দীর কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক অদ্ভুত বীরত্বে প্রীত হইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। বালক ভাগীরথীতীরে যথারীতি সৎকার করিয়া পিতৃদেহের পবিত্র ভস্মরাশি গঙ্গার পবিত্র সলিলে ভাসাইয়া দিল। সেই পবিত্র ভস্মরাশিতে তাহার কয়েক বিন্দু পবিত্র অশ্রু পতিত হইয়া পবিত্রতার বৃদ্ধি করিল। পবিত্রসলিলা ভাগীরথী সেই পবিত্র অশ্রুসিক্ত পবিত্র ভস্মরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া কুলু-কুলু-নাদে প্রবাহিতা হইলেন। বালক পিতৃকার্য্য সমাপনান্তর স্নানান্তে উদাসমনে শিবিরে প্রত্যাগত হইল, ও পিতৃবিয়োগে কাতর হইয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যৎসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল। নবমবর্ষীয় রাজপুত বালকের এইরূপ অদ্ভুত সাহস ও পিতৃভক্তি জগতের জতিহাসে বিরল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে গিরিয়ার যুদ্ধ একটি প্রধান ঘটনা। রাজপুত বালক জালিম সিংহের অদ্ভুত কাহিনী সেই ঘটনাকে আরও স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

হিন্দুর ন্যায় পিতৃভক্তি জগতের কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। যাহারা "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" এই মহাবাক্য কার্য্যতঃ পদে পদে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের নিকট পিতৃভক্তিতে জগতের সকল জাতিকে যে অবনত হইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত জলন্ত পিতৃভক্তির কাহিনী আমরা অনেক সময়ে বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। পাশ্চাত্য জগতে এই সকল দৃষ্টান্ত কত সাহিত্যে, কত কবিতায়, স্থান পাইয়াছে, কিন্তু আমরা শত চেষ্টা করিলেও বিস্মৃতিস্তর হইতে কিছুতেই তাহাদের উদ্ধার করিতে পারি না। টিসিনসের যুদ্ধে হানিবলকর্ত্তৃক আহত হইয়া কর্ণিলিয়াস

সিপিও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলে, তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয় বালক সিপিও পিতার দেহ বহন করিয়া শিবিরে আনয়ন করিয়াছিল। এজ্‌হিলের যুদ্ধে প্রথম চার্লসের বৃদ্ধ সেনাপতি লিণ্ডসে পার্লিয়ামেণ্ট সৈন্যকর্ত্তৃক আহত হইলে, তাঁহার দ্বাত্রিংশবর্ষবয়স্ক পুত্র লর্ড উইলোবী পিতাকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। নীল নদের ভীষণ সমরে বালক ক্যাসাবিয়েঙ্কা পিতার আদেশপালনের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। এই সমস্ত অদ্ভুত কাহিনী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বর্ণিত ও কবিতায় গীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের নবমবর্ষীয় বালক জালিমের কথা কেহ অবগত আছে কি না জানি না। কেবল যে স্থানে তাহার অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, গিরিয়া-প্রান্তরের সেই স্থানকে আজিও লোকে জালিম সিংহের মাঠ বলিয়া থাকে। কিন্তু জালিম সিংহের বিবরণ কেহই অবগত নহে। বিস্মৃতির ঘনীভূত অন্ধকার আমাদিগের উজ্জ্বল রত্নরাজিকে চিরদিনের জন্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। জানি না কোন কালে তাহাদের উদ্ধার হইবে কি না।

উইলবারফোর্স

[৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।]

[এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক নদীয়া জেলায় সুবর্ণ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা—বিডন পার্কে ইনি শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম্মবিষয়ে প্রতি রবিবারে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। ইংরাজী বাঙ্গালা সংস্কৃত তিন ভাষাতেই ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই তিন ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন। ইহাঁর বলিষ্ঠ হৃদয়ের তেজোময় ভাব গৈরিকনিঃস্রাবের ন্যায় ইহাঁর গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থানে দেদীপ্যমান দৃষ্ট

হয়। গ্যারিবল্ডি, ম্যাট্‌সিনি, ওয়ালেস, জনষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত, 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' 'প্রাণোচ্ছ্বাস' '৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনবৃত্ত, 'সমালোচন-মালা' 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সিদ্ধ লেখনীপ্রসূত। ইনি ১৩১১ সালে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।]

এই মহাত্মা ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে ইংলণ্ডের অন্তর্গত হল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্যযত্নে লালিতপালিত হন। তিনি কলেজ ছাড়িয়াই একবিংশতি বৎসর বয়সের সময় হল নগরের প্রতিনিধিরূপে পার্লিয়ামেণ্টে প্রবিষ্ট হন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মন্ত্রিপ্রবর পিটের সহিত তাঁহার সখ্য সংস্থাপন হয়। পার্লিয়ামেণ্টে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহাদের সেই সখ্য দৃঢ়ীভূত হয়। উইলবারফোর্সের স্বাভাবিকী প্রতিভা নিরন্তর পরিমার্জ্জনে অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বাগ্মী বলিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং হাউস্‌-অব-কমন্সে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি বৈধ-সংসার-কার্য্যে মন্ত্রিপ্রবর পিটের প্রধান হস্তাবলম্বন হইয়াছিলেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দাস-ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সন্ন্যাসী। নিজের সুখ, নিজের দুঃখ ও নিজের সৌভাগ্যে তিনি পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, কি গৃহে, কি বাহিরে—তাঁহার মনে একই সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা—কেমন করিয়া ইংলণ্ডের অক্ষালনায় কলঙ্ক অপনোদন করিবেন। কেমন করিয়া দাসব্যবসায় উঠাইয়া দিবেন। তিনি দেখিলেন, দাস-ব্যবসায় ইংলণ্ডের অমল ধবল যশে গভীর কলঙ্করেখা। তিনি দেখিলেন,

এই প্রথা থাকিতে ইংলণ্ডের স্বাধীনতাপ্রিয়তা জগতের পরিহাসোদ্দীপক। অসংখ্য দাসপতি অগণ্য মুদ্রা দিয়া লক্ষ লক্ষ দাস ক্রয় করিয়াছেন, তাহাদের পরিশ্রমে অতুল সম্পত্তির ঈশ্বর হইয়াছেন—এক্ষণে কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে এ লাভকর বাণিজ্য হইতে নিরস্ত করেন—ভাবিয়া ভাবিয়া—নিরন্তর ভাবিয়া তাহার তনু ক্ষীণ হইল, তথাপি তাঁহার একই সংকল্প। কিরূপে ইহা সংসিদ্ধ করিবেন—তাহা জানেন না, অথচ এই লক্ষ্য সংসাধনে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন। অবিচলিত ও একাগ্রচিত্তে তিনি এই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। সেই বহুকাল-ব্যাপী তপস্যায় তিনি যে ধৈর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সৎসাহস প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংলণ্ড বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব অবতারণ করেন। তিনি প্রতিবার প্রস্তাব করিতেছেন, প্রতিবার তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। কিন্তু সেই নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমিক কিছুতেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহেন। হিমাচলের ন্যায় তিনি অটলভাবে সমস্ত আপত্তি-ঝটিকা সহিতে লাগিলেন। বৎসর বৎসর তাঁহার প্রস্তাব উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অথচ সে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল না। সাগরগামিনী স্রোতস্বিনীর গতির ন্যায় অভিলষিত বিষয়ে কৃতসংকল্প মনের গতিকে কে রোধ করিতে পারে? এক এক করিয়া ক্রমে বিশ বৎসর অতীত হইল। এ ঘোর তপস্যা পার্লিয়ামেণ্ট আর সহিতে পারিলেন না। এই তপস্যানলে ক্রমে পাষাণ গলিয়া জল হইল। যে নয়ন এত দিন শুষ্ক ছিল, আজ তাহা হইতেও অবিরল বারিধারা পড়িতে লাগিল। উইলবারফোর্স কাঁদিয়া কাঁদিয়া—অবিরাম কাঁদিয়া শেষে পার্লিয়ামেণ্টকেও কাঁদাইলেন, এতদিনে পার্লিয়ামেণ্টের চৈতন্য হইল।

তাঁহারা কি কুকাজ করিয়া আসিয়াছেন! দাসব্যবসায়ের অনুমোদন করিয়া তাঁহারা কি দুরপনেয় কলঙ্কের অংশভাগী হইয়া আসিয়াছেন! আজ তাঁহাদের পাপ তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া তাঁহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে যত দাস ছিল, পার্লিয়ামেণ্ট দাস-প্রভুদিগের নিকটে সমস্ত কিনিয়া লইয়া, তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন; আর ভবিষ্যতের জন্য বিধান করিলেন যে, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে আর কেহ কখন দাস ক্রয় করিতে পারিবে না। যেমন পাপ, তেমনই প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্তে জগৎ মুগ্ধ হইল। জাতীয় আত্ম-ত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে আর কখন দেখা যায় নাই। এক উইলবারফোর্সের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সমস্ত ইংলণ্ড আত্মবিসর্জ্জন শিখিল। একজনের কঠোর তপস্যায় সমস্ত পার্লিয়ামেণ্ট-সভা সন্ন্যাসী-সমিতিতে পরিণত হইল। যে জাতি এক টাকা ছাড়িতে কাতর ছিলেন, সে জাতি আজ কোটী কোটী টাকা অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন; কোটী কোটী টাকা দিয়া দাস-প্রভুগণের নিকট দাসগণের স্বাধীনতা ক্রয় করিলেন। যে জাতি একদিন ঈশ্বরের মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি মানব-আকৃতি লইয়া বাণিজ্যধ্বজা উড়াইয়াছিলেন, এই মহাপুরুষের চরিত্রগৌরবে সেই জাতির রণতরী সকল পৃথিবী হইতে দাস-ব্যবসায় উঠাইবার জন্য আজও সমস্ত সমুদ্র আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছে। ধন্য উইলবারফোর্স,—তুমিই ধন্য! কতদিন হইল তুমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছ, কিন্তু তোমার জীবন্ত বিশ্বপ্রেম আজও প্রতি ইংরাজকে দেবতা করিয়া রাখিয়াছে।

মহর্ষি মনসূর।

[মোজাম্মেল হক্‌।]

[কবিবর মোজাম্মেল হক্‌—নদীয়া-শান্তিপুর ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি একজন প্রচীন সাহিত্যসেবী। ইহাঁর রচিত 'মহর্ষি মনসূর' অতি উপাদেয় গ্রন্থ। অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় কঠোর নির্য্যাতিত ধর্ম্মবীর মনসূরের ধর্ম্মপ্রভাব কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এই পুস্তকে তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত হক্‌ সাহেব 'হজরত মোহাম্মদ' 'ফেরদৌসী চরিত' 'শাহ্‌নামা' 'জাতীয় ফোয়ারা' 'জোহরা" 'হাতেম তাই' প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া লেখকসমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর ভাব অতি মনোহর, ভাষা শব্দসম্পদে ও পদবিন্যাসকৌশলে সাতিশয় লালিত্যপূর্ণ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ 'মোস্‌লেম ভারত' ও 'লহরী' নামক কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। হক্‌ সাহেব একজন অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও মহাকর্ম্মী পুরুষ। ইনি শান্তিপুরমিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যান, এবং এই বার্দ্ধক্যেও স্থানীয় জনসাধারণের উন্নতি-বিধায়ক সদনুষ্ঠানসমূহে যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টায় ত্রুটি করেন না।]

মরুময় পুণ্যদেশ আরবের উত্তরাংশে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভুবনবিদিতা তুরস্কভূমি। তুরস্কের অগ্নিকোণ-স্থিত প্রদেশকে ইরাকে-আরবি কহে। ইরাকে-আরবির পূর্ব্ব-সীমা-সংলগ্ন প্রদেশের নাম ইরাকে-আজ্জম। ইহা ইরাণ (পারস্য) রাজ্যের অন্তর্গত। ইরাকে-আজ্জম প্রদেশও শস্যশ্যামল ও সৌন্দর্য্যের নিকেতন। সেই পুণ্যভূমির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা, গুরুত্ব-মহিমা, শোভা-সমৃদ্ধি প্রভৃতির সৌসাদৃশ্য জগতে কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ ভূমিতে প্রকৃতি ভুবন-মোহিনীর বেশে নিত্য বিরাজিত। ইহার সতেজ ও

কোমল তরুলতিকা, নয়নরঞ্জন কুসুমকানন ও সুরসাল ফলপূর্ণ শোভন উদ্যান-সমূহ দেখিলে ইহাকে যেন ভূস্বর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিয়োগ-বিধুর মানব, প্রকৃতির এই লীলানিকেতনে আসিবামাত্র ক্ষণকালের জন্য সংসারের সকল শোক-তাপ ও জ্বালা-যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। এমনি হইার মোহিনা শক্তি! এমনি ইহার চিত্তচমৎকারী সৌন্দর্য্যের বিকাশ! এই বাহ্য সৌন্দর্য্য হইতেই আবার মানবের মানসিক সৌন্দর্য্য গঠিত হয়—মানব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া থাকে। সেই হেতুই বোধ হয়, এই সিদ্ধস্থানে অনেক সুফী-সাধু জন্ম-গ্রহণ করিয়া জগতে অমরকীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়া-ছেন; তজ্জন্যই বোধ হয়, এই ভূমির সেই বিশ্ব-বিদিত শুভ্রশ্রী সিরাজ ও তুসনগরের সুসন্তান, পারস্যকাব্য-কাননের কোমলকণ্ঠ কোকিল মহাত্মা শেখ সাদী ও মহাকবি ফেরদৌসী তুসী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি খাজা হাফেজ সিরাজী একদিন সুললিত তানে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। আহা! এক্ষণে তাঁহারা কত শত মহাপ্রাণ পুরুষের সহিত সেই ভূমিতেই চিরবিশ্রামশয্যায় শয়ান আছেন।

ইরাণের এই গৌরবমণ্ডিত প্রদেশের সন্নিধানে ময়জা নামে এক পল্লী অবস্থিত। ইহা বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও বোগদাদ হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। পূর্ব্বকালে এই পল্লীতে মনসুর নামে এক অতি ধর্ম্মশীল, বিচক্ষণ ব্যক্তি বাস করিতেন। সত্যনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতাগুণে পল্লীস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মকর্ম্ম-সমূহ নিয়মিতরূপে প্রতিপালন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার হস্ত সাধ্যানুসারে দীনহীনের অভাবমোচনে উন্মুক্ত ও পরোপকারে রত থাকিত। তিনি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরকে পানীয়প্রদান ও নিঃসহায়কে সাহায্য

করাই ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। প্রতিবাসিগণ তাঁহাকে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ জানিয়া চিরদিন তদীয় আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিত। প্রকৃতপক্ষে পরমকারুণিক জগৎপিতা জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; দয়াময়ের অনুগ্রহে সংসারে তাঁহার কোন বস্তুরই অভাব লক্ষিত হইত না।

সহধর্ম্মিণী পূর্ণগর্ভা। সেই পতিব্রতা পুণ্যময়ী মহিলা তদবস্থায় যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক যথাকালে শুভলগ্নে একটি সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত পরমসুন্দর তনয়রত্ন প্রসব করিলেন। পুত্রের শশধর-সন্নিভ কমনীয় কান্তিচ্ছটায় অন্তঃপুর প্রতিভাসিত হইল। তদ্দর্শনে পিতা অপরিসীম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সন্তানের শুভকামনায় একাগ্রচিত্তে সর্ব্বানন্দময় বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন; এবং স্বীয় অবস্থানুযায়ী অর্থাদি বিতরণ করত দীনদুঃখীদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে শিশুকে আশীর্ব্বাদ করত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। গৃহ উল্লাসময়। আনন্দ যেন স্বয়ং মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। আজ যেন দিনমণির প্রথম কররাশি অধিকতর শুভ্র—অধিকতর উজ্জ্বল অথচ শৈত্যগুণবিশিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। সুশীতল মলয়-মারুত মৃদুমন্দ হিল্লোলে স্ফূর্ত্তিপ্রচারে তৎপর হইল। পুরবাসিগণ এই শুভদিনে আনন্দে মত্ত; প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবেরাও সে উৎসবে যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। হাস্য-কোলাহলে গৃহপ্রাঙ্গণ শব্দায়মান হইল।

বিধাতার কৃপায় এবং জনসাধারণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে এই ক্ষণজন্মা শিশু শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পিতামাতা পরমযত্নে শিশুর লালনপালন করিতে লাগিলেন।

এ জগতে ভবিষ্যদ্‌গর্ভে নিহিত তত্ত্বের মর্ম্ম কে অবগত হইতে পারে? যিনি কালে ঐশী শক্তিপ্রভাবে অলৌকিক কার্য্য-সাধন করত জগৎকে বিমোহিত ও বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন, যে দৃঢ়ব্রত সত্যসন্ধ মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন থাকিয়া ধর্ম্মোন্মত্ততার চরমসীমায় সমুপস্থিত হইয়া পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, যিনি তপস্বিকুলের অগ্রণী ছিলেন, যাঁহার বৈচিত্র্যময় পার্থিব জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং অন্তঃকরণ বিস্ময়রসে আপ্লুত ও অভূতপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাঁহার সৌভাগ্যবান্ পিতা যথাসময়ে আত্মীয়-বন্ধু-দিগকে নিমন্ত্রণ করত সমারোহের সহিত পান-ভোজনে প্রীত করিয়া শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে শিশুর নাম হোসেন-মন্‌সুর রাখিলেন।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত হোসেন-মন্‌সুরের বিদ্যাশিক্ষার সময় উপস্থিত হইল। কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ তদীয় পিতা স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। এই স্থানেই হোসেন-মন্‌সুরের বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়। কিন্তু সোস্তরেই তাঁহার শিক্ষার পরিণতি হইয়াছিল। মন্‌সুর সোস্তর-নিবাসী মহাত্মা সহল্-বেন্-আবদুল্লার নিকটে আসিয়া আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিক্ষার গুণে তদীয় অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতি, গাম্ভীর্য্য, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মচিন্তা ক্রমশঃ প্রবল-রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন; অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাপ্রভাবে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তিনি ধর্ম্মবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থপাঠ সমাপন করিয়া অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

অতঃপর হোসেন-মন্‌সুর শিক্ষাগুরু সহল্-বেন্-আবদুল্লার সংসর্গ ত্যাগ করত ইরাকে-আরবির দিকে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে এই

অঞ্চলে তত্ত্ববিদ্যার সমধিক চর্চ্চা হইত। মনসুর তথায় আগমন করিয়া নিয়ত সাধু-সহবাসে তত্ত্বজ্ঞানালোচনায় সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহাতে তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার—ধর্ম্ম-পিপাসার শান্তি হইল না।

বস্‌রা নগরী ইরাকে-আরবির একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তত্রত্য প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, অধিবাসিগণও তদ্রূপ সুধী ও সজ্জন। সে ভূমি বহুসংখ্যক তত্ত্বদর্শী তপস্বীর লীলাস্থল। সেইস্থানে গমন করিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে ভাবিয়া তিনি বস্‌রায় গমন করিলেন এবং ওমর-বেন্-ওস্‌মান নামক প্রসিদ্ধ সাধক পুরুষের সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরে কোন কারণবশতঃ তিনি বস্‌রা ত্যাগ করিয়া বোগদাদে উপনীত হইলেন।

ইরাকে-আরবির মধ্যে বোগ্‌দাদ একটি সুরম্য ও সুপ্রসিদ্ধ নগর। তৎকালীন বোগ্‌দাদের অতুলনীয় সুষমা সমৃদ্ধি বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জগন্মান্য আব্বাস-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা আবুজাফর-মনসুর ১৬৫ হিজরীতে এই নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এখানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন; এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠববিধানার্থ অকাতরে প্রভূত অর্থব্যয় করেন। ইহা • বহুসংখ্যক উপাসনালয়, মিনার-শ্রেণী, তোরণ-মালা, বিদ্যালয়, প্রমোদ-কানন, রাজপ্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরাদির সৌন্দর্য্য-গৌরবে তৎকালে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

বোগ্‌দাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোমদ। ইহার চতুর্দ্দিকে শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্র, মনোহর কুসুম-সুরভিত উপবন, নানাবিধ ফলোদ্যান ও জনকোলাহলশূন্য, শান্তিপূর্ণ বিশ্রামালয়-সমূহ বিরাজিত। অদূরে কল্লোলময়ী ফোরাৎ (ইউফ্রেতিস্) নদী প্রবাহিত; এবং নির্ম্মল-সলিলা স্রোতস্বিনী দজ্‌লা (টাইগ্রীস্) নগরের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া উভয়তীরবর্ত্তী সৌধমালার পাদদেশ বিধৌত করিতে নিয়ত প্রবৃত্ত।

বিধাতার কৃপায় এই নগরী এককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-শিক্ষার কেন্দ্রভূমি, শত শত ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি রলীলানিকেতন এবং ন্যায়-বিচারক বিচক্ষণ নরপতি ও অসীমপরাক্রমশালী যোদ্ধৃবৃন্দের স্মৃতিকগাররূপে পরিণত হইয়াছিল। ইহার সুনির্ম্মল যশঃসৌরভে ভূমণ্ডলস্থ নরনারীগণ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মহাপ্রাণ মন্‌সুর বোগ্‌দাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নগরবাসীদিগের সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি-নিবন্ধন সর্ব্বদা ক্ষুব্ধচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বোগ্‌দাদ নগরে পবিত্র সৈয়দবংশোদ্ভব খাজা-আবুল-কাসেম-অল্‌-জুনেদ্‌-শাহ নামে একজন অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পরম পণ্ডিত বাস করিতেন। তৎকালে বোগ্‌দাদে তাঁহার ন্যায় তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ পুরুষ আর কেহই ছিলেন না। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ তাঁহার নিকট নখদর্পণবৎ প্রতীয়মান হইত। তিনি নিয়ত শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন।

মন্‌সুর মহাজ্ঞানী সৈয়দ-জুনেদ্‌-শাহের গুণগ্রামের কথা অবগত হইয়া, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। অনন্তর সৈয়দ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তৎসমীপে অবস্থান করত দিবারাত্রি গুরু-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। সৈয়দ সাহেব মন্‌সুরের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ, অচলা গুরুভক্তি, বিনয় ও অটল সহিষ্ণুতা-দর্শনে তাঁহার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি মন্‌সুরের এতাদৃশ অক্লান্ত পরিশ্রমের পারিতোষিক-প্রদান-মানসে কৃপাবলোকনে স্মিতমুখে কহিলেন, "মন্‌সুর! আমি তোমার অধ্যবসায়, গুরুভক্তি শিক্ষানুরাগ, চরিত্রবল ও মধুর বিনয়-ব্যবহারে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তোমার হৃদয়ের ভাব অতি উচ্চ ও মহান্। জগতে

পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই আছে। অতএব যাও, অবগাহন করিয়া আইস, অদ্য আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।”

অনন্তর মনসুর স্নানাদি সমাপনান্তে গুরুর সম্মুখীন হইলেন। পরে সৈয়দ সাহেব তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ক যাবতীয় গূঢ় তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিলেন। ফলতঃ উর্ব্বর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় মনসুরের হৃদয়ে এই গুরূপদেশ অতীব ফলোপধায়ক ও শুভজনক হইল। তিনি গুরূপদেশ-সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। এইরূপে মনসুরের হৃদয়াকাশের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত ও জ্ঞাননেত্র বিকসিত হইল। মনসুর নবজীবন লাভ করিলেন। তিনি ঐশিক প্রেমে মুগ্ধ হইয়া একেবারে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন।

ভারতবর্ষ।

(সেকেন্দর ও সেলুকস্।)

[৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।]

[দ্বিজেন্দ্রলাল—১২৭০ সালে ৪ঠা শ্রাবণ গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺কার্ত্তিকচন্দ্র রায়। ১৩২০ সালে ৩রা জ্যৈষ্ঠ ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন।—

“দ্বিজেন্দ্রের অসাধারণত্বে অহমিকার লেশ ছিল না, ছিল—প্রেমময় ঔদার্য্যের স্নিগ্ধ ধারা। আমি তাহাতে অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়াছি। দ্বিজেন্দ্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ সব স্মৃতিই আমার নিকট চন্দ্রিকার ন্যায় মিষ্ট। তাঁর গান মধুর, গল্প মধুর, হাস্য মধুর, রঙ্গ ব্যঙ্গ সবই মধুর * * * * *

দ্বিজেন্দ্রের রচনা বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট। সে বলের মধ্যে পালোয়ানের প্যাঁচ খেলা না আছে, তা নয়, কিন্তু সেগুলি এতই সজীব, এতই সহজ যে তা পাঠকের নিকট একটি অবলীলাগতি প্রস্রবণের ন্যায়—তেজে জ্বল্ জ্বল্, মাধুর্য্যে চল চল!

* * * * * * *

তাঁহার সত্যানুরাগ সাহিত্যে যুধিষ্ঠিরের মত ভাল মানুষ হইয়া পাঠককে দেখা দেয় না; মিথ্যার প্রতি বিরাগও ইন্দ্রজিতের মত লুকাইয়া বাণ মারে না। বঙ্গসাহিত্যের মহারথগণমধ্যে তিনি যেন মধ্যম পাণ্ডব। * * আজ রঙ্গ রচনাকে ছাপাইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর রচনাই বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন জোয়ার আনিয়াছে। * * * * দ্বিজেন্দ্রের সরল স্বভাব কাপট্যের শিরে ভীমের গদার মত সোজা সরল আসিয়া পড়িত। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বিনয় দাম্ভিকের আত্মম্ভরিতায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা আর এক মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। কিন্তু যখনই মনে হয়, কেবল সত্যের প্রতিষ্ঠাই তাঁর উদ্দেশ্য, তখন তাঁহার অসংযমের প্রতিও কেমন একটা মমতা আসিয়া উপস্থিত হয়।"]

কি সংস্কৃত কি ইংরাজী সকল সাহিত্যেই নাটকের বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ উপযুক্ত বিষয় এবং লিখনকৌশলের অভাব ছিল বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে নাটকীয় প্রবন্ধের স্থান হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি পাঠ করিলে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, এত সংক্ষেপে ভারতের ভিতর বাহিরের এমন নিখুঁৎ চিত্রাঙ্কন একমাত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভান্বিত পুরুষ দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীমুখেই সম্ভবে। আশা করি ইহা অধ্যাপক ও অধ্যেতা উভয়েরই সবিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে।

সেকেন্দর।—সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি! প্রাবৃটে, ঘনকৃষ্ণ

মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে, প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের ন্যায় এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্ব্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, এর অভ্রভেদী ধবল তুষারমৌলি নীল হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটেছে, এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে!

সেলুকস। সত্য সম্রাট্!

সেকেন্দর।—কোথাও দেখি, তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু ক'রে দাড়িয়ে আছে, কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কেথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গম পর্ব্বতসম মন্থরগমনে চলেছে, কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্ররেখায় প'ড়ে আছে! আর সবার উপরে এক সৌম্য গৌর দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন কর্চ্ছে,—তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস! এ শৌর্য্য পরাজয় ক'রে আনন্দ আছে! পুরুকে বন্দী ক'রে আনি যখন, সে কি বল্লে জান?

সেলুকস। কি সম্রাট্!

সেকেন্দর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম্। আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর? সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল—রাজার প্রতি রাজার আচরণ! চমকিত হ'লাম! ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করলাম।

সেলুকস। সম্রাট্ মহানুভব!

সেকেন্দর। মহানুভব! তারপরে তাঁর সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখ্লেই একটা উল্লাস আসে, আর আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আসি নাই! আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে সে দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট্‌?

সেকেন্দর। সে দিগ্বিজয় সম্পুর্ণ করতে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই। কি আশ্চর্য্য সেনাপতি, দূর মাসিডন থেকে রাজ্য জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত ক'রে চ'লে এসেছি, ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশত্রু-সৈন্য ধূমবাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি, অর্দ্ধেক এসিয়া মাসিডনের বীরপদভরে কম্পিত হয়েছে। নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়শকট অবাধে চালিয়ে এসেছি, কিন্তু বাধা পেলেম এই প্রথম—সেই শতদ্রু-তীরে।

অহঙ্কার।

(জনক ও শুকদেব)

[কালীবর বসু]

[কালীবর বসু—খুলনা জেলার বাগেরহাট থানার অধীন পারমধুদীয়া গ্রামে ১২৭৭ সালে আশ্বিন মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺ রামলাল বসু। ইনি ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা-নর্ম্মালস্কুল হইতে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী আছেন। বর্ত্তমানে ইনি খুলনা—বাহিরদীয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে বঙ্গ ভাষার অধ্যাপক। ইনি গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায় সিদ্ধহস্ত। নানাবিধ প্রতিকূলতায় ইনি কোন বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া খ্যাতিলাভে সৌভাগ্য-বান্‌ হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইঁহার রচিত 'সন্দর্ভ-কুসুম' ও 'জ্ঞান-কুসুম'

নামক বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থদ্বয় যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি ইঁহার চিন্তাশীলতা এবং লিখননৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। এই পুস্তকে সঙ্কলিত ইঁহার প্রবন্ধ কয়েকটি পাঠ করিলে ইঁহার ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং ভাষার মাধুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।]

পুরাণপ্রণেতা, বেদবিভাগকারী ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব প্রাচীন ভারতের এক অতি প্রসিদ্ধ পুরুষ। তাঁহার গুণের অবধি ছিল না। তিনি আজন্মসন্ন্যাসী। সংসারের মলিন হস্ত এক দিনের জন্যও তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহাপ্রাণ ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় শুকের হৃদয়ও ভগবৎ-প্রেম-ভক্তি-বিশ্বাসে শৈশব হইতে পরিপূর্ণ ছিল। শুক যে সরল শুভ্র কৌমুদীস্নিগ্ধ সুন্দর হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কু-বাসনার কুজ্ঝটিকায় অথবা কু-সংসর্গের পঙ্কিলতায় তাহা কখনও মলিন হয় নাই।

শুক জ্ঞান, বিদ্যা, চরিত্র, ধর্ম্ম—সর্ব্ববিষয়ে পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঈদৃশ গুণাতিশয্যবশতঃ তাঁহার একটি বিষম দোষ জন্মিয়াছিল,—তিনি আপনাকে তৎকালীন সমস্ত মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—অপর সকল লোকই অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পাপময় সংসারে বাস করিয়াছে, সুতরাং কোন না কোন প্রকারে তাহারা পাপের সংস্পর্শে আসিয়াছে, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও সংসারাশ্রম স্বীকার করেন নাই, সুতরাং তাঁহার তুল্য নিষ্পাপ পুরুষ আর কেহই নাই।

শুকের এই মূঢ় সাহংকার ভাব অনতিবিলম্বে তীক্ষ্ণধী ব্যাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইল। তিনি পুত্রের পরিণাম ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন,—"হায়! অহংকারের ন্যায় শত্রু আর নাই। অহংকার পতনের অগ্রগামী দূত। ইহা আলেয়ার ন্যায় মানুষকে

মরণের পথে চালিত করে। লেবু, তেঁতুল, চাল্‌তা প্রভৃতি যে কোন অম্লবস্তুই যেমন দুগ্ধকে স্বাদহীন করে, সেইরূপ অহংকার রূপজই হউক, আর গুণজই হউক অচিরে মানুষের মাধুর্য্য—গুণরাশি হরণ করে। শুকের এই দুর্ব্যাধির চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক।”

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মনস্বী ব্যাস স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বাবা শুক, তোমাকে মিথিলায় যাইতে হইবে। তথায় পরম ভাগবত রাজর্ষি জনকের নিকট কিছুদিন বাস করিয়া তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে।”

শুক, পিতার অনুজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিলেন; এবং মনে মনে বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণসন্তান, সংসারে চির অনাসক্ত সন্ন্যাসী! আর জনক ক্ষত্রিয় রাজা, বিষয়-বুদ্ধি-পরায়ণ, ভোগবিলাসে চির অভ্যস্ত। আমাকে কি না জনকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে!” মনে মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইলেও শুক পিতার অবাধ্য পুত্র ছিলেন না। তিনি পিতৃ-নিদেশ পালন করিতে মিথিলায় গমন করিলেন।

এ দিকে জনক যোগবলে শুকের আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শুক রাজসভায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথোচিত সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক তাঁহার উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দেশ ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া সে দিনের জন্য সভাভঙ্গ করিলেন।

পরদিন শুক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সাদরে রাজপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া জনকের রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া মিথিলেশ্বরের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। শুক বেশ বুঝিতে পারিলেন যে,—জনক একজন সুদক্ষ নরপতি, দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে ইহাঁর দক্ষতা অসাধারণ! রাজকর্ত্তব্য-প্রতিপালনে ইহাঁর বিন্দুমাত্র আলস্য বা ঔদাস্য নাই। সুতরাং ইহাঁর কার্য্যে এবং

রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। জনক যে একজন সুদক্ষ নরপতি সে বিষয়ে বিকল্পের স্থান নাই, কিন্তু ইহাতে শুকের মন উঠিল না। তিনি যেজন্য আসিয়াছেন, তাহার ত কিছুই ইহাঁতে নাই। জনকে তিনি যে ভাব দেখিতে চান, তাহার ত কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। শুক দিন দিন অধীর হইতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন শুক আত্মগোপনে অসমর্থ হইয়া জনকের নিকট আপনার আগমনকারণ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে জনক বলিলেন, "আপনি উদার অনন্তধী মহামতি ব্যাসের পুত্র, নিজেও আজন্মসংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমি আপনাকে আর কি শিক্ষা দিব? তবে আপনি যেমন আপনার পিতার আদেশ পালন করিতে এখানে আসিয়াছেন, আমিও সেইরূপ আপনার পিতার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার সহিত তত্ত্ববিদ্যাবিষয়িণী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু একটি কথা আপনাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, দানরূপ পুণ্যানুষ্ঠান কেবল দাতার ইচ্ছাতেই সুসম্পন্ন হয় না; দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই তুল্য শ্রদ্ধা না থাকিলে কোন দানই সার্থক হয় না। বিশেষতঃ বিদ্যা-দান। বিদ্যারত্ন গুরুকে যেমন শ্রদ্ধাভরে দিতে হয়, ততোধিক শ্রদ্ধাসহকারে শিষ্যকে গ্রহণ করিতে হয়। আপনার পিতাই লিখিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"

গুরুতে এবং গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্ ছাত্রই জ্ঞানলাভের অধিকারী; শাস্ত্রকারেরা আরও বলেন,—

"নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রুয়াদ্
নাভক্তায় কদাচন।"

জিজ্ঞাসিত না হইয়া কাহাকে কোন উপদেশ দিতে নাই।

অভক্তকে কদাচ কোন উপদেশ দিবে না। আর্য্যরীতি-অনুসারে গুরুসন্নিধানে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া শিষ্যকে বলিতে হইবে—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্!"

আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাপন্ন, আমাকে শিক্ষা দান করুন।

এইরূপে এই পবিত্র ব্রতের আরম্ভ করিতে হয়। গুরুতে শ্রদ্ধা, শিক্ষণীয় বিষয়শ্রবণে উগ্র আকাঙ্ক্ষা শিক্ষায় সফলতালাভের প্রশস্ত পথ। এই জন্যই এই সকল অনুশাসন। যাহা হউক আগামী কল্য আপনার সহিত তত্ত্ববিদ্যাবিষয়িণী আলোচনা হইবে। কিন্তু একটি অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে,—কল্য রাজসভায় আগমন-কালে আপনি আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট কেহ বা কিছু সঙ্গে লইয়া আসিবেন।"

শুকদেব ভাবিলেন,—এ আর বেশী কথা কি? এই বিপুল সংসারে আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয় কে? এজন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। রাজপথে কত লোকই চলে, আগমনকালে সম্মুখে যাহাকে পাইব সঙ্গে করিয়া আনিলেই চলিবে।

পরদিন শুক রাজসভায় গমনকালে একজন পথিকের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"চল, তোমাকে আমার সহিত রাজসভায় যাইতে হইবে, আমা অপেক্ষা কোন নিকৃষ্ট লোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে আমার প্রতি রাজার আদেশ আছে। তুমি নিশ্চয়ই আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

পথিকের হয় ত রাজসভায় যাইতে বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু মর্য্যাদা-হানিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,— "কি বল ঠাকুর, আমি তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট? কি দেখিয়া তুমি

এই অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ? দেখ, তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ, তোমার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মন বুদ্ধি বিচারশক্তি আছে, আমারও ও সব আছে। দৈহিক সম্পদ্—শোভাসৌষ্ঠব, বলশক্তি, সাহসবিক্রম—কিসে আমাকে তোমা অপেক্ষা হীন দেখিতেছ ? তবে আমাকে নিকৃষ্ট স্থির করিলে কেন ? যদি বল,—তুমি আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্, সে কথারও কোন অর্থ নাই। বুদ্ধি একরূপ নহে। তুমি হয়ত শাস্ত্রে বিচক্ষণ, আমি বা শস্ত্রে বিলক্ষণ ; তুমি হয়ত বিজ্ঞানে নিপুণবুদ্ধি, আমি বা শিল্পে কুশলহস্ত , সুতরাং ইহাতেও কাহারও উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপিত হইতে পারে না। তবেই দেখ, দেহ মনের সম্পর্কে আমি তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট হইলাম না। তার পর আত্মার কথা—আত্মা ত সকলেরই এক, আত্মার সম্পর্কে মানুষে মানুষে ত কোন প্রভেদ নাই, এমন কি করীতে কুক্কুরে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে কোন ভেদ নাই। তবে ঠাকুর, আমি নিকৃষ্ট হইলাম কিসে ?'

শুকদেব লজ্জিত হইলেন। তিনি পথিকের হাত ছাড়িয়া দিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—পথিক যথার্থই বলিয়াছেন। দেহ ক্ষণ-বিধ্বংসী,—যাহা এখন আছে, তখন নাই, সেই নশ্বর পদার্থ লইয়া কোন বিচার চলে না। আত্মাই একমাত্র সনাতন বস্তু—তাহা সকলেই সমান ভাবে বিদ্যমান। তবে পথিক আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবেন কেন ?

পরক্ষণে ভাবিলেন,—মানুষ না হয় সকলেই সমান। ভাল, এই যে অদূরে গাভীটি বিচরণ করিতেছে, ও নিশ্চয়ই আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই ভাবিয়া দ্রুতপদে গিয়া গাভীটির শৃঙ্গ ধারণ করিলেন ! গাভী শুকের মনোভাব বুঝিতে পরিয়া শৃঙ্গ সঞ্চালনপূর্ব্বক বলিলেন,—"ঠাকুর,

আমার বিচরণে বাধা দিও না,—আমি তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট নহি, দেখ, পুণ্যের জন্যই লোক বড় হয়, সেই পুণ্যের মূল পরোপকার।—

"পরোপকারঃ পুণ্যায়, পাপায় পরপীড়নম্।"

ভূতের অর্থাৎ জীবের পূজায় ভূতনাথের তৃপ্তি, জীবসেবাতেই নিখিল-পালক বিষ্ণু পরিতুষ্ট। ললাটে ত যথেষ্ট চন্দন লেপন করিয়াছ কিন্তু ঠাকুর, কায়ের যথার্থ তৃপ্তি চন্দনে নয়,—পরোপকার-সাধনে। এত দিন ত সংসারের যথেষ্ট অন্ন ধ্বংস করিলে, জিজ্ঞাসা করি, তাহার বিনিময়ে কাহারও কিছু উপকার করিয়াছ কি? আমাকে গরু বলিয়া নিকৃষ্ট-বোধে ধরিতে আসিয়াছ, একটু ভাবিয়া দেখিলে মহাশয়ের মত মনুষ্য-জন্মের গৌরব না করিয়া এই গোজন্ম লাভ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে।"

গাভী পুনরায় বলিতে লাগিল—"দেখ, আমি স্বতোজাত তৃণ-দলে ও বাপী-তড়াগের জলে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া, ভগবানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতারসে বিভোর হইয়া কেমন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছি, কাহারও হিংসা করি না, ক্ষতি করি না, কেমন সুখের জীবন আমার! আমি মাঠের ঘাস খাইয়া লোকের হিত করি, নিজের বৎসকে বঞ্চিত করিয়া তোমাদিগকে দুগ্ধ দিই। আমারই দুগ্ধ পান করিয়া এতই বলবান্ হইয়াছ যে, নিকৃষ্ট-বুদ্ধিতে আমার শৃঙ্গ ধরিতে সাহসী হইয়াছ। আমি মরিয়াও তোমাদিগের উপকার করিতে ভুলি না। আমার মত গরু হইয়া জন্মিতে পারিলে তোমার ঠাকুর-জন্ম সার্থক হইত। তোমার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ কিছু আয়োজন করিতে হইত না। দিবসে বনে বনে বিচরণ করিয়া, উদর ভরিয়া আহার করিয়া পরম সুখে দিনপাত করিতে পারিতে; রজনীতে ভূতলে শয়ন করিয়া সাধুর চরণধূলি অঙ্গে মাখিয়া ধন্য

হইতে পারিতে। তোমার গোময়ে দেবগৃহ মার্জ্জিত হইত, তোমার দুগ্ধজাত ঘৃত দেবতার ভোগে লাগিত।

—'ঘৃতায়ু বৈ পুরুষঃ'—

এ উক্তিটি ভুলিয়া গিয়াছ কি? তোমাদেরই এক ঋষি ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইতে বিধি দিয়াছেন, সে ঘৃত আমারই দুগ্ধজাত। আমার দুগ্ধে প্রস্তুত পরমান্ন তোমাদের পরম উপাদেয় খাদ্য ; চরু দেবতার ভোজ্য। গরু বলিয়া আমি তোমা অপেক্ষা হীন! ঠাকুর এ হীন বুদ্ধি ত্যাগ কর।" শুক নীরবে গাভীর শৃঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর শুক নিকৃষ্টবোধে সহসা সম্মুখস্থিত এক বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন। বৃক্ষ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না। প্রত্যুত শুকের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নবকিসলয়চ্ছলে হাস্যভরে বলিলেন,—"শুক, ভাঙ্গ, ভগ্ন শাখার উপর উপবেশন কর, বড় ক্লান্ত হইয়াছ! আমি ব্যজন করিতেছি, ক্লান্তি দূর হউক, একটু সুস্থ হও, পরে আমার কয়েকটি কথা নিবিষ্ট মনে শ্রবণ কর। তারপর কে উৎকৃষ্ট, কে নিকৃষ্ট বিচার করিও।"

কিয়ৎক্ষণ পরে তরুবর বলিতে লাগিলেন, "শুক, তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার মাতাপিতাকে 'পুৎ' নামক নরক হইতে ত্রাণ করিয়া 'পুত্র' নাম পাইয়াছ, আমিও আমার রোপণকারীকে ত্রাণ করি বলিয়া 'তরু' নাম লাভ করিয়াছি। সৃষ্টির সার পদার্থ দুইটি—জীব ও উদ্ভিদ্। উভয়ের নিশ্বাসবায়ু উভয়ের প্রাণ। তবুও বলিব উদ্ভিদ্—জীবের জীবন। তরুহীন মহী—মরুময়,—মৃত। পৃথিবী তরু পাইয়াই প্রাণ পাইয়াছেন। তরুর ভিতর দিয়াই বসুন্ধরার বিভব, গৌরব শতপথে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তরুর নশ্বর পল্লবে তাঁহার অঙ্গবিলাস, ফুলে শোভাসৌরভ, ফলে রসবৈচিত্র প্রকাশমান। তরুর

গুণে ধরিত্রী তোমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ অপোগণ্ড শিশুগুলিকে লালন পালন করিতেছেন। ধরিত্রী যেদিন মরকতচ্ছদে আপনার শুষ্ক অঙ্গ আবৃত করিতে পারিলেন, সেই দিনই তিনি সরস স্নেহবতী হইয়া জীবনিবাসের যোগ্য হইলেন। কবি বলিয়াছেন—

'ঘনীভূত মাতৃস্তন্য—
তরু পেয়ে মহী ধন্য।
পালিছে সংসার মহী তরুর প্রসাদে'

আমি নিকৃষ্ট! ছি! শুক, তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন? আমার সৌভাগ্যের কথা স্মরণ কর,—দেখ, সুন্দর পত্র-পুষ্প-পল্লবরাজি আমার অঙ্গাভরণ; বর্ষা আমার পদ ধৌত করে, শিশির আমাকে মুক্তাফলে সাজায়, বসন্তের প্রথম সোহাগ আমারই ভোগ্য। দেখ, মলয়-মারুত আমার পাতায় পাতায় কেমন ক্রীড়া করে, আমিই ত সংসারের রাজা!

'রাজার মাথায় ছত্র,
আমার মাথায় পত্র।'

কোকিল আমার বৈতালিক, অলির গুঞ্জন আমারই শ্রবণরঞ্জনের জন্য।"

"শুক, গর্ব্ব নয়,—স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, পথিক ক্লান্ত হইয়া আমার নিকট আগমন করে, আমি শত প্রকারে আমার অতিথির সেবা করি, তাহার আতপতাপ হরণ করিতে, পর্য্যটন-ক্লেশ নিবারণ করিতে আদরে আমার শীতল ছায়ায় বসাইয়া শত করে তাহাকে ব্যজন করি। আমি কেবল তাপাপনোদক বা শ্রান্তিনাশক নহি, পরন্তু তোমাদের রোগপ্রশমক, ক্ষুধাহারক ও তৃষ্ণানিবারক। শুক, তোমরা কঠিন কুঠারে আমাকে ছেদন কর, আমি কি

ছায়াদানে বিরত হই, না সৌরভদানে কৃপণতা করি? আমি সংসারে বিনয়ের অদ্বিতীয় আদর্শরূপে বিরাজমান, তোমাদের কাহারও দু' পয়সা সঞ্চিত হইলে তিনি কাহারও নিকট মস্তক নত করিতে চাহেন না। দেখ-দিখি ফলসম্পদ্ লাভ করিয়া আমি কেমন অবনত হইয়া আছি! আমার সহিষ্ণুতাই বা কত! কেহ আমার মস্তকে লোষ্ট্রাঘাত করিলে আমি মিষ্টফলদানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করি। আমি নিকৃষ্ট! আমি আমার পত্র পুষ্প ফল মূল তোমাদের কল্যাণের জন্য অবিরত বিতরণ করিতেছি,—আমার ভাণ্ডার জীবের হিতের জন্য নিয়ত উন্মুক্ত। জীব ইচ্ছামত আমার সম্পদ্‌রাজি লুণ্ঠন করিতেছে, এমন কি আমাকে বিনষ্টও করিতেছে। শুক, ত্যাগই পরম ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতাই পরম পৌরুষ। আমার ন্যায় ত্যাগী, আমার ন্যায় সহিষ্ণু তোমার বংশে কেহ আছে কি? আমি নিকৃষ্ট!"

তরুবাক্যে শুক ব্যথিত ও বিকলচিত্ত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর নিকৃষ্ট-বোধে একমুষ্টি মৃত্তিকা-আহরণে হস্ত প্রসারণ করিলে, পৃথিবী কম্পিতা হইলেন। শুকের পদস্খলন হইল, তিনি পড়িয়া গিয়া পৃথিবীর বুকে কান দিয়া তাঁহার প্রাণের কথা শুনিতে লাগিলেন। পৃথিবী বলিলেন,—"শুক, আমি নিকৃষ্ট! দেখ; তোমার গর্ভধারিণী যখন তোমাকে গর্ভে স্থান দিতে অস্বীকৃতা হইলেন, তুমি তাঁহাকে বিষম যন্ত্রণা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলে, তখন আমিই তোমাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিলাম, পরে আমারই স্নেহযত্নে, আমারই আলোকে বাতাসে আমারই খাদ্যপানীয়ে এত বড়টি হইয়াছ—এই জন্যই আমাকে 'ধাত্রী' 'ধরিত্রী' বলে। আজ মানুষ হইলে, আমাকে মাতা বলিয়া বন্দনা করিতে।—

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'

বলিয়া কত ভক্তি করিতে। বাবা, মানুষ ত হও নাই, তাই এই মা-টিকে মাটি বলিয়া ঘৃণা করিতেছ! হায় অদৃষ্ট! ঘৃণা কর, তাহাতে আমার গ্লানি বা অগৌরব নাই। আহা, আমি কুপিতা হইলে জীব দাঁড়াইবে কোথায়? মাটি যাহা সয়, জীবের গর্ভধারিণীও তাহা কি সহিতে পারে? শুক, তুমি ত অপণ্ডিত নও, বিচার করিয়া দেখ দেখি,—তোমার আরম্ভে আমি, পরিণামেও আমি, তোমার জন্মে আমি, মরণেও আমি। সাধুমুখে কি কখন শুন নাই—

'মাটির দেহ মাটি হবে।'

আমি তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট? তোমরা সাধু সন্ন্যাসী; বিষ্ঠা চন্দনে সমান জ্ঞান করিতে পারিয়াছ বলিয়াই না তোমাদের আদর! বলি, বিষ্ঠা চন্দন আমার মত সমানভাবে আত্মগত করিতে শিখিয়াছ কি? সুরভি ফুল, সুরস ফল, প্রাণরূপী শস্য সবই আমার অঙ্গের বিকার। তোমার রজত কাঞ্চন মণিরত্ন—সবই আমার অন্তর-কান্তি! তোমাদের শর্করা সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন—সবই আমার পরিপক্ব পরিণাম! আমি তোমা-অপেক্ষা নিকৃষ্ট! শুক, লোকের উৎকর্ষের গণনা হয় কিসে? সহিষ্ণুতাই মহত্ত্বের মানদণ্ড নয় কি?—তোমরা হলপ্রবাহে আমার বক্ষঃ শতধা বিদীর্ণ করিতেছ, আমি তোমাকে প্রচুর শস্য দান করিতেছি; তোমরা কুদালচালনে আমার দেহে গভীর ক্ষত বা খাত উৎপাদন করিতেছ, আমি প্রতিদানে নির্ম্মল পানীয় জলপ্রদানে তোমাদের প্রাণহারিণী তৃষ্ণার শান্তি করিতেছি। তোমরা আমাকে চক্রে আবর্ত্তিত, অনলে দগ্ধ করিতেছ; আমি স্থালীরূপে তোমাদের অন্ন পাক করিতেছি, ইষ্টকমূর্ত্তিতে তোমাদের নিরাপদ্ গৃহ নির্ম্মাণ

করিতেছি। আমি মাটি হইয়া—খাঁটি হইয়া পড়িয়া আছি, আমি নিকৃষ্ট! আর দাম্ভিক তুমি, অকৃতজ্ঞ তুমি উৎকৃষ্ট! ধন্য তোমার সিদ্ধান্ত!”

ধরণীর সারগর্ভ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া শুক লজ্জায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন, কিন্তু নিকৃষ্ট ত কিছু লইতে হইবে। অনন্তর অনন্যগতি হইয়া লজ্জা ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে বিষ্ঠা-গ্রহণের সংকল্প করিলেন। উঠিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণের পর কিঞ্চিৎ সদ্যঃ পুরীষ প্রাপ্ত হইয়া উহা গ্রহণার্থ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন অমনি সে দুর্গন্ধ-বিস্তারে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিল। শুক, একান্ত কাতর স্বরে বলিলেন,—“বিষ্ঠে, তুমিও আমাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছ?” বিষ্ঠা বলিল, “হঁা, করিতেছি, একবার কেন একশত বার নিষেধ করিতেছি!” শুকদেব. দীনভাবে বলিলেন,—“কারণ শুনিতে পাই কি?” বিষ্ঠা ঘৃণাভরে উত্তর করিল, “ঠাকুর, তুমি কি এতই নির্ব্বোধ যে, এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারিতেছ না? বুঝিতে পারিতেছ, কিন্তু বুঝিতে চাহিতেছ না। মানব গর্ব্বের অবতার, তাই সে আপনাকে জগতের শ্রেষ্ঠ ভাবিতে লজ্জা বোধ করে না। দেখ ঠাকুর, বেশী ক্ষণ নয়, কেবল দশ দণ্ড পূর্ব্বে আমি মতি মোদকের দোকানে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ছিলাম, পরে তোমাদেরই একজনের উদরস্থ হওয়ায় এই অল্পকালের মধ্যে আমার এই ঘৃণিত পরিণাম! গো মহিষের উদর ত ভোজ্যের পক্ষে বৈকুণ্ঠ, কুকুর বিড়ালের উদরও বরং ভাল; কিন্তু কি জীবই জন্মিয়াছ তোমরা! কি অশুদ্ধ উদরই তোমাদের! আমি কি ছিলাম! কি হইয়াছি! না জানি তোমার স্পর্শে আমাকে পুনরায় কি হইতে হয়! তাই অনুরোধ—ঠাকুর আমাকে ছুঁইও না।”

শুক বিষ্ঠার বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মগ্লানিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং নিতান্ত দীনভাবে রিক্তহস্তে রাজসভায় উপনীত হইয়া মলিনমুখে নতনয়নে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরম প্রাজ্ঞ জনক সমুদায় বুঝিতে পারিয়াও শুকের শিক্ষার্থ বলিলেন,—"ঋষে, একাকী রিক্তহস্তে আসিলেন যে! কই, কিছু ত সঙ্গে আনেন নাই! ও কি নয়নে জল কেন?"

শুকের পীড্যমান হৃদয়ের নিরুদ্ধ সন্তাপ যেন ফুৎকার পাইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব, আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে! এতদিন আমি কি অশুভ বুদ্ধির বশবর্ত্তী ছিলাম! কি বিষম ঘৃণার ঘূর্ণিবায়ু আমাকে অধঃপতনের তমোময় গর্ভে পরিচালিত করিতেছিল! আজ আপনার প্রসাদে, আপনার মহতী শিক্ষার গুণে আমার মদোদ্ধত উন্নত মস্তক বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়াছে। আমি কি মূঢ়! ভবাদৃশ মহাত্মাকেও আমি আমা অপেক্ষা হীন মনে করিয়াছি। এখন হইতে আমি আপনার শরণাগত শিষ্য, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে সুশিক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ করুন।"

শুকের অনুতাপ দেখিয়া জনকের প্রাণ আকুল হইল, তিনি সরল কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "শুক, এতদিন তুমি অহংকারের গুরুভারে প্রপীড়িত হইতেছিলে। আজ দয়াময় ভগবানের কৃপায় সেই দুরন্ত দানব তোমার হৃদয়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। দেখ, শুক, বিধাতার রাজ্যে কিছুই নিরর্থক নহে। জগতের কার্য্য সহজে সমাধানের জন্য প্রত্যেক বস্তুরই সার্থকতা আছে। আর সেই বিশিষ্ট সার্থকতার জন্যই এখানে কেহ কাহা অপেক্ষা হীন নহে, এ

সংসারে ব্রাহ্মণের যেমন প্রয়োজন, শূদ্রেরও সেইরূপ প্রয়োজন ; এখানে সূর্য্য চাই, চন্দ্র চাই, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকাটিও চাই ; এখানে পর্ব্বত চাই, সাগর চাই, সেইরূপ অতিক্ষুদ্র বালুকাটিও চাই। নতুবা জগৎকার্য্য অসম্পূর্ণ থাকে। এখানে একের অভাব অপর সকলে একত্র হইয়াও পূরণ করিতে পারে না। এই স্থূল তত্ত্বটি না বুঝিয়া এতদিন বৃথা অভিমানে স্ফীত হইয়া অনর্থক বিড়ম্বিত হইয়াছ। অহঙ্কার উন্নত প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া অহঙ্কারী ও অপরের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করে। অহঙ্কারের বিনাশ না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। প্রেম জগৎকে সুন্দর করে, প্রেমে মানবহৃদয় মনোহর ও মহীয়ান্ হয়। তোমার অনন্তধী পিতৃদেব অষ্টাদশ প্রকার মৃত্যুর উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অহঙ্কার এক প্রকার। এতদিন তুমি পদে পদে মৃত্যু ভোগ করিয়া আসিয়াছ। আজ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া অমৃতের সন্ধান পাইলে ; আজ, শুক, তত্ত্বজ্ঞানমন্দিরের মাত্র প্রথম সোপান অতিক্রম করিলে।"

পরিশ্রম ও প্রতিভা।

[কালীবর বসু।]

"অমুক বালক সর্ব্বদা পড়ে, বড় বেশী পরিশ্রম করে" ইত্যাদি উক্তি যেন আজকাল গ্লানির কথা হইয়া পড়িয়াছে। অনেক বালকের ধারণা যে, প্রতিভা ও পরিশ্রম—দুই বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত গুণ। তাহাদের মতানু-

সারে একাধারে এই বিপরীতপ্রকৃতিক গুণদ্বয়ের সমন্বয় অসম্ভব। তাহারা কল্পনার কুহকে পড়িয়া মনে করে যে, যে ব্যক্তি পরিশ্রমী, তিনি প্রতিভার অধিকারী হইতে পারেন না, অথবা প্রতিভাশালীকে কখনও পরিশ্রম করিতে হয় না। উক্তমতপ্রিয় বালকগণ পাছে প্রতিভাহীন স্থূলবুদ্ধি বলিয়া বিবেচিত হয়, এই ভয়ে চিরকাল অনভিজ্ঞ থাকিতে প্রস্তুত তথাপি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও চিন্তাশীলতার প্রভাবে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জনসমাজে বরণীয় হইতে অভিলাষী নহে।

প্রতিভা আকাশ হইতে ভূতলে বারিপাতের ন্যায় কোনও অদৃশ্য স্থান হইতে মানবের চিত্তক্ষেত্রে পতিত হয় না। কঠোর পরিশ্রম, নিরবচ্ছেদ অধ্যবসায় ও নিরন্তর-অভ্যাসবশে বিষয়বিশেষে প্রতিভার অধিকারী হইতে হয়। সমুন্নত সৌধ যেমন ভূপৃষ্ঠ হইতে একবারেই মস্তক উত্তোলন করে না,—স্থপতির নিপুণ হস্তে ইষ্টকের পর ইষ্টক স্থাপিত হইলে, যথাকালে উন্নত অট্টালিকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; সেইরূপ সামান্য লোকের সামান্য বুদ্ধিও, তাহার নিয়মিত পরিশ্রম ও সুব্যবস্থিত চিন্তাগুণে ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিয়া পরিশেষে প্রতিভারূপ অলৌকিক গুণে পরিণত হয়।

বস্তুতঃ প্রতীচ্য কর্ম্মবীরগণের হৃদয়ে অদৃষ্ট বা প্রতিভার স্থান নাই। তাঁহারা একমাত্র পুরুষকারেরই উপাসক। অসামান্য মনীষাসম্পন্ন নিউটন বলিতেন, তিনি নিয়ত পরিশ্রম ও চিন্তার ফলেই তাদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।" দরিদ্রের সন্তান জেমস্ গারফিল্ড্ কেবলমাত্র পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অদৃষ্ট বা প্রতিভায় বিন্দুমাত্রও আস্থা ছিল না। তিনি বলিতেন, "অদৃষ্ট আলেয়ার ন্যায় মনুষ্যকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, কদাচ উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে না।" তাঁহার

মতে অক্লান্ত পরিশ্রমই প্রতিভা। ভারতবর্ষীয় মনীষীদিগের বিবেচনায় অদৃষ্ট একান্ত উপেক্ষিত না হইলেও তাঁহাদিগের মতেও অদৃষ্ট অপেক্ষা পুরুষকারের আসন উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে মনস্বিবর ভীষ্ম অদৃষ্ট অপেক্ষা পুরুষকারের প্রাধান্য স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মবীর অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "পুরুষে আমি পৌরুষ।"

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥"
"নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।"—

ইত্যাদি প্রাচ্যসূরি-বিরচিত সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ উক্তিও পুরুষকারের জয় ঘোষণা করিতেছে।

প্রত্যেক কর্ম্মবীরের জীবনপর্য্যালোচনায় এ সত্য দৃঢ়ীভূত হইতে পারে। এই যে বঙ্গগৌরব বাণীবরপুত্র বহুভাষাবিৎ হরিনাথ চৌত্রিশ বৎসর বয়সে ঊনত্রিংশটী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিশ্ব-বাসীর বিস্ময়োৎপাদন করত অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়া ভারত-বাসীকে কাঁদাইয়া অকালে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তিনি এই প্রতিভা বৃথা-পর্য্যটনে অকিঞ্চিৎকর আমোদ কৌতুক অথবা নিদ্রা-লস্যে সময়াতিপাত করিয়া লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ-সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বলিতেন যে, তিনি বাল্যে তাদৃশ মেধাবী ছিলেন না, প্রত্যুত কেবল কঠোর পরিশ্রমের ফলেই তিনি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া 'বিদ্যাসাগর হইতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রতিভালাভ বঙ্গে কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? মাইকেল

মধুসূদনকে কবিপ্রতিভা অর্জ্জন করিতে যে কি সাধনা করিতে হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ডিমস্থিনিস্ বক্তৃ-শক্তি লাভ করিতে যে বিপুল চেষ্টা যত্ন অধ্যবসায়ের নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার স্মরণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

উল্লিখিত শ্রমশীল ব্যক্তিগণকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া সাধারণ অলসস্বভাব লোক সকল তাঁহাদিগকে ঐশশক্তি সম্পন্ন প্রতিভার অবতার বলিয়া বন্দনা করে। বস্তুতঃ অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতাই যে প্রতিভা, সুচিরব্যাপী সুনিয়ন্ত্রিত সাধনা-বলেই যে প্রতিভা লভ্য, তাহা সাধারণ অলস চক্ষু চাহিয়া দেখে না।

বহুস্থলে প্রতিভা একের জীবনেও লব্ধ নহে। একাধিক কঠোর পরিশ্রমী ও অক্লান্ত-অধ্যবসায়ীর কর্ম্মময় মহজ্জীবনের মধ্য দিয়া ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া ইহার পূর্ণ পরিণতি ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌষ্ঠবলাভ হয়। বহু পূর্ব্বে ভারতীয় মনীষী আর্য্যভট্ট বলিয়া গেলেন, "চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি।" পৃথিবী চলিতেছে, কিন্তু স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কতদিন পরে প্রতীচ্য পণ্ডিত কোপর্নিকসের সাধনায় আর্য্যভট্টের উদ্ভাবিত সত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটিল। ভারতে ভাস্করদ্যুতি আচার্য্য ভাস্কর বলিয়াছিলেন, "আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যত্তয়া প্রক্ষিপ্যতে তত্তয়া ধার্য্যতে" অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে; এই জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে যাহা উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহা পুনরায় ভূতলে পতিত হইয়া থাকে। আতাফলের পতনকারণনির্ণয়ে নিবিষ্টচিত্ত পাশ্চাত্ত্য মনীষিবর নিউটনের মহাসাধনায় ভাস্করাচার্য্যের প্রতিভা পূর্ণ সৌষ্ঠব লাভ করিল।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের জনক, পরিশ্রম প্রতিভারও উৎপাদক। আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই বিবিধ বস্তুর সহিত পরিচিত হই, তখন বস্তুতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম হইয়া ভূয়োদর্শন-নিবন্ধন আমাদের নিত্য

নূতন নূতন জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে, এই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিই প্রতিভা নামে অভিহিত। আমরা নিয়ত যে সকল বিষয়ে চিন্তা করি, আমাদের মন তাহাতে তন্ময় হইয়া যায়, তখন আমরা তদ্বিষয়ক বিবিধ তত্ত্বের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হই। বিষয়বিশেষে কোনও কিছু নূতন—অন্যের অজ্ঞাত—তত্ত্বের প্রকাশই প্রতিভার কার্য্য। সুতরাং প্রতিভাশালী হইতে হইলে কঠোর পরিশ্রমী ও গভীর চিন্তাশীল হইতে হইবে, এ কথা কোনমতে বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

অশ্রু-জল।

[৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ।]

[ইনি ১২৫০ বঙ্গাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার ভরাকর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺শিবনাথ ঘোষ, মাতার নাম ৺উমাতারা। ইনি অসাধারণ বাগ্মী এবং অমিতশক্তিশালী লেখক ছিলেন। ইহাঁর সুলিখিত প্রবন্ধাবলীতে মনোহর পদবিন্যাস ও গৌরবময় ভাবোল্লাসদর্শনে মুগ্ধ হইয়া লোকে ইহাঁকে বঙ্গের 'কারলাইল' বলিত। ইহাঁর অধ্যয়নানুরাগের কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কালীপ্রসন্ন এক সময়ে দিবারাত্রিতে অতি কম হইলেও ১৪।১৫ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ফার্সী-মক্তবে থাকাকালে, শিখিয়াছিলেন যে,—পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ না করিলে প্রকৃত বিদ্যা হয় না। তিনি এই হেতু পাঠদ্দশায় শ্রেণীপাঠ্য পুস্তকের ন্যায় কাশীরামের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুখস্থ করিয়াছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ 'বান্ধব' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 'প্রভাত-চিন্তা' 'নিভৃত-চিন্তা' 'নিশীথ-চিন্তা' 'ভক্তির জয়' প্রভৃতি মহামূল্য গ্রন্থরাজির গৌরবে কালীপ্রসন্ন বঙ্গবাসীর হৃদয়ে চিরপূজিত থাকিবেন। উক্ত প্রবন্ধটি তাঁহার 'নিভৃত-চিন্তা' হইতে গৃহীত হইল।]

তোমার ঐ মণিমুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ, আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়নবিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। মণিমুক্তা পরিণামে পৃথিবীর ধূলিসমান; বালক, বণিক্, কিংবা বিনোদ-ভাব-বিহ্বলা অবলা ভিন্ন আর কাহারও কাছে উহার মূল্য নাই। অশ্রু-মালা দ্রবীভূত মনুষ্যহৃদয়ের সজীব ধারা; পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিতই উহার তুলনা নাই।

যাহারা ক্ষণকালও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চাহে না, অথবা প্রকৃতির চাপল্যে ক্ষণকালের তরেও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না।—কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন ও মৃত্যু, এবং মানব-জীবনের উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বই যাহাদিগের নিকট হাস্যের বিষয়, সেই বিকটবুদ্ধি পুরুষেরা অবশ্যই মনুষ্যের অশ্রু লইয়া উপহাস করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বাংশে অন্তঃসারহীন ও প্রাণবিহীন নহেন, মনুষ্যত্ব একবারে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, উহা স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করে। মনুষ্যের অশ্রুজল বস্তুতঃও সামান্য পদার্থ নহে।

অশ্রুজল দয়ার প্রবাহ। স্বার্থপরতা নিভৃতে বসিয়া ক্ষতিলাভ গণনা করে। লোভ কাহার কি হরণ অথবা কোথা হইতে কি উপায়ে কখন কি আহরণ করিবে, সেই চিন্তায় সর্ব্বত্র সাবধানে বিচরণ করে। ঈর্ষ্যা পরের সুখ-সম্পদ্ ও সম্মানদর্শনে আপনি পুড়িয়া মরে এবং বিষাক্ত দৃষ্টি ও বিষাক্ত বাক্যে অন্যকে পুড়াইয়া ভস্ম করে। কিন্তু পর-দুঃখ-কাতরা দয়া, অশ্রুজলে বিগলিত হইয়া আপনাকে আপনি পরের আগুনে ঢালিয়া দিয়া, পরকীয় হৃদয়ের দুঃখ-দাহ নির্ব্বাণ করে। দয়ার অশ্রু দেবতারও দুর্লভধন। যাঁহার চক্ষু দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, তিনি দেবতার মধ্যে দেবতা। কেন না তাঁহার জীবন পরের জন্য,—তাঁহার

অস্তিত্ব পরের সুখশান্তির উদ্দেশ্যে,তিনি দয়ার বিগ্রহ অথবা দয়ার সেবক। সুতরাং তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে,—লোকলোচনের অগোচরে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে—লৌকিক জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনন্ত অনুষ্ঠানে, দয়াময় মন্ত্রের মহাসাধক, দয়াময়ের প্রকৃত উপাসক।

আপনার পুত্র কন্যা ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তির প্রতি সকলেরই স্নেহসঞ্চার হয়; কিন্তু পরকে প্রমুক্তচিত্তে স্নেহ বিলাইতে পারে কে? যেখানে রূপ আছে, গুণ আছে, প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি কিংবা কুসুমের সুকুমার সৌরভ আছে, সেখানে সকলেরই অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রূপ নাই, গুণ নাই, নয়ন-মনোবিনোদের কিছুই নাই—আছে দুঃখের কালিমা এবং দুর্ভাগ্যের কশাঘাতজন্য ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন, তাদৃশ স্থানে হৃদয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত স্ফুরণে অনুরক্ত হইতে পারে কে? যেখানে সুখসামগ্রী মাক্ষিকপ্রকৃতি মনুষ্যগণকে মধুগন্ধে মোহিত রাখে, সেখানে সকলে গিয়া মমতার বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে। বিপদের ঘূর্ণবাতে সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহাও বিনাশ পাইতেছে, এবং আশার শেষ আলোকবর্ত্তিকাও নিবিয়া যাইতেছে, আপনা হইতে সেখানে যাইয়া আপনি আপনাকে মমতার রজ্জুতে জড়াইতে পারে কে? যে পবিত্র ও পূতচরিত্র, শ্রদ্ধাস্পদ, তাঁহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতে পারে। কিন্তু যে অধম, অপাত্র, অপবিত্র ও অস্পৃশ্য তাহাকে তুলিয়া লইয়া আবরিতে পারে কে? হৃদয় যেখানে উড়িয়া পড়িতে সুখানুভব করে,—সুখসংস্পর্শে শীতল হয়, সেখানে সকলেই স্বয়মাহূত উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে সকলই দুঃসহ, দুর্নিরীক্ষ্য ও নিদারুণ দুর্ভোগ,—যে স্থলের বীভৎস দৃশ্যে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যতীত আর কোন ভাবের উদয় হয় না, সেখানে আপনা হইতে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে কে?

তুমি প্রভুত্বের উপাসনায় আত্মসমর্পণ কর,—প্রভুত্বলাভে পূর্ণকাম হইবার জন্য অকথ্য ক্লেশ স্বীকার কর—সে তোমার আপনার জন্য ; পরের জন্য নহে। তুমি কীর্ত্তির বিশ্ববিনোদ বংশীর ধ্বনি শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কীর্ত্তিকর ও যশস্কর যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর—সে সকল কঠোর কষ্টজনক ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সমাজের কীর্ত্তিস্তম্ভনিবহে আপনার নামাক্ষর লিখিয়া রাখিতে যত্নপর হও, তাহাও তোমার আপনার জন্য, পরের জন্য নহে। পরের জন্য দয়ার অশ্রু,—পৃথিবীর অমূল্যধন, প্রাণপ্রদ, প্রাণস্পর্শী এবং অপ্রত্যক্ষ মহত্ত্বের প্রত্যক্ষ ফল।

অশ্রুজল ভক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। মনুষ্যের অন্যান্য মনোবৃত্তি মনুষ্যকে সমতল ভূমিতেই টানিয়া রাখে। শক্তি উহার স্বর্গীয় প্রভাবে মনুষ্যকে স্বভাবতঃই উপরের দিকে আকর্ষণ করে,—উপরে লইয়া যায়। যেমন মনুষ্যের স্থূলদেহের উত্তমাঙ্গ মস্তক, তেমনি মনুষ্যের সূক্ষ্মশরীর অধ্যাত্ম-দেহের উত্তমাঙ্গ ভক্তি। যাহার আত্মা দুর্ভাগ্যবশতঃ ভক্তিশূন্য সে একপ্রকার কবন্ধ। সে সকল বিষয়েই অর্দ্ধমনুষ্য অথবা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধঃস্থানীয় জীব। তাহার চক্ষু সৌন্দর্য্যের সুখসমুদ্রের মধ্যে অহোরাত্র মরালের মত ভাসিয়া রহিয়াও অতৃপ্ত রহে। কেন না, যিনি সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে সুন্দর অথবা উহার সজীব প্রস্রবণ, সে তাঁহাকে খুঁজিতে চায় না, খুঁজিবার জন্য আকুল হয় না, অথবা খুঁজিয়াও তাঁহার সৌন্দর্য্যময় অমল-সত্তা অনুভব করিতে পারে না। তাহার শ্রুতি এবং তাহার রসনা প্রভৃতি বৃত্তিও শব্দে কিংবা স্বাদে, মাধুর্য্যের ক্ষণিক মোহময় অনুভূতিতেই উন্মাদিত রহে। কিন্তু, যিনি মাধুর্য্যের মধ্যে মধুর, অথবা মাধুর্য্যের সজীব প্রস্রবণ, ঋষিরা যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া হৃদয়ে জানিয়াছেন যোগীরা যাঁহাকে

বুঝিতে অথবা বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যময় আনন্দের ভাব তাহার কাছে চিরদিনই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহে। সেই সুন্দর ও সেই মধুর শুধুই ভক্তিলভ্য, সুতরাং ভক্তিই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি অথবা সর্ব্বোচ্চ বৈভব। এই ভক্তিরও বিকাশ অথবা বিলাস সৃষ্টির আদি কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই মনুষ্যের অশ্রুজলে। মনুষ্যের আত্মায় যখন ভক্তির প্রস্রবণ উথলিয়া উঠে, তখন নয়নে ভাগীরথীর তরঙ্গ আপনা হইতেই খেলিতে আরম্ভ করে, এবং সেই তরঙ্গ যে স্থান দিয়া ধারায় বহিয়া যায়, সেই স্থানেই জীব, সসম্ভ্রমে দুই পাশে দাঁড়াইয়া জয়-জয়-কোলাহলের সহিত, তাহার শোভা দেখে। সে তরঙ্গের কণিকামাত্রও যেখানে যাইয়া স্পৃষ্ট হয়, সেখানে পাষাণ দ্রব হয়;—পাষাণ হইতে অধিকতর কঠিন ভূমি কুসুমের ন্যায় কোমল হইয়া মানবজগৎকে কৃতার্থ করে।—বৃদ্ধ ও যুবা হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া নাচিয়া গাইয়া মনুষ্যের বিস্ময় জন্মায়, এবং যিনি ভক্তির অশ্রুতে আপনি আপ্লুত হইয়া, আপনার প্রাণটা পরের প্রাণে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হন, আত্মপর সকলেই তখন তাঁহার পায়ে যাইয়া লুটাইয়া পড়ে। মনুষ্য এই জগতে মধ্যে মধ্যে ভক্তির এইরূপ অশ্রুধারা দেখিতে পায় বলিয়াই মনুষ্যের নাম মনুষ্য। নতুবা মনুষ্যের পাশব-সুখ-পিপাসা মানব-সমাজকে এত দিনে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিত। এবং যে সকল সূক্ষ্মসূত্রিত সুকোমল বাঁধনী মনুষ্যসমাজকে এক দৃঢ়বদ্ধ বিরাট্ বিগ্রহের ন্যায় জীবিত রাখিয়াছে, তাহা দগ্ধরেণুর ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া যাইত।

অশ্রুজল প্রেমের নীরব গীত। শব্দে যাহা পরিস্ফুট হয় না,

সঙ্গীত আপনি যাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, প্রেমিকের নীরব-নিঃসৃত অশ্রুজলে সেই অনির্ব্বচনীয় কাহিনী নীরবে পরিব্যক্ত হয়। যখন হৃদয় প্রেমভরে উদ্বেল হয়,—আতট পরিপূর্ণ হয়—হৃদয়ে যখন আর ধরে না, তখন নয়নে আপনা হইতে ধারা বহে। উহা তখন লজ্জার উপদেশ ও নিন্দার শাসন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। কাহার সাধ্য প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি অবরোধ করে? এই নিমিত্তই প্রেমিকের মিলনে অশ্রু, বিরহে অশ্রু, সুখে দুঃখে সকল সময়ই উচ্ছলিত অশ্রুজল। আমরা প্রীতির কথা কাব্যে শুনি, হৃদয়ে কখন অনুভব করি না। প্রীতি আমাদের নিকট আকাশকুসুম। আমরা কদাচিৎ চিত্তের আবেগে উহার ক্ষণিক স্পর্শে উন্মাদিত হইতে পারি। কিন্তু, উহা আমাদিগের পাশবসুখাসক্ত, দুরিতদুর্গন্ধময়, নিরয়তুল্য হৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যে প্রীতির কণিকামাত্র লাভ করিয়া অবনী সময়ে সময়ে অমরাবতীর অপূর্ব্বকান্তি ধারণ করিয়াছে, যদি সেই আশাময়ী, আবেশময়ী ও অমৃতময়ী প্রীতিই আমাদিগের হৃদয়কে ভরিয়া রাখিত, আমাদিগের চক্ষু, তাহা হইলে, কখনও এইরূপ শিলাসম কঠিন রহিতে পারিত না।

অশ্রুজলে শোকের তর্পণ। সাবধান শোকাকুলের পবিত্র হৃদয়কে কেহই সাংসারিক সুখের বৃথা প্ররোচনা দিয়া বঞ্চনা করিতে যত্ন করিও না। তাহাকে নিভৃত নির্জ্জনে, নিঃশব্দ রোদনে, অবিরামবর্ষী অশ্রুজলে প্রিয়জনের তর্পণ করিতে দেও। সে তাহার হৃদয়বাহিনী ফল্গুগঙ্গার অমল বারিতে অঞ্জলি পূরিয়া হৃদয়ারাধ্য প্রিয় জনের উদ্দেশ্যে অর্পণ করুক; এবং মনুষ্য যে যেখানে আছে,—যে বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া, কূট-চিন্তার আবর্ত্তজলে হাবুডুবু খাইয়া এবং সংসারের তমসাচ্ছন্ন তরঙ্গরাজিতে আহত ও প্রত্যাহত, উৎক্ষিপ্ত

ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া, মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিতেছে, সে প্রকৃতিপ্রণোদিত, প্রকৃতির অকর্ণশ্রুত অভ্রান্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মানবহৃদয়ের এই অন্তর্গূঢ় ও আশাপ্রদ, প্রাকৃত আরাধনা দেখিয়া আশায় উল্লসিত হউক।

অনুতাপীর মুক্তিপ্রবাহও অশ্রুজলে। দগ্ধ মেদিনী, অবিরল-পতিত বৃষ্টিধারায় অভিষিক্ত না হইলে ফলপুষ্পে সুশোভিত হয় না। দুষ্কৃতির মুর্ম্মুর-দাহনে ততোধিক দগ্ধ মনুষ্যহৃদয়ও অশ্রুজলে না ভিজিলে, মনুষ্যোচিত মহত্ত্ব, মনুষ্যোচিত দয়াদাক্ষিণ্য এবং প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি মনুষ্যোচিত কমনীয় কুসুমে শোভান্বিত হইতে পারে না। মনুষ্য যখন আত্মগ্লানির অগ্নিকুণ্ডে অঙ্গার তুল্য হইয়া আত্মার পুনঃশুদ্ধির জন্য অশ্রুজলে স্নান করে,—হৃদয়ের অঙ্গার-কালিমা প্রক্ষালনের জন্য ধারায় অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করে,—যে হস্ত মনুষ্যের শান্তির পথে কাঁটা দেওয়া এবং মনুষ্যের অন্তরতম সুখে আঘাত করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে অগ্রসর হইত না, যখন সেই হস্ত পুনরায় মনুষ্যের উপকার-ব্রতে ব্রতী হয়;—যে জিহ্বা পূর্ব্বে পরনিন্দার কদর্য্য-পঙ্ক অথবা পরের ক্লেশকর কালকূট গরল বই আর কিছুই বর্ষণ করিতে জানিত না, যখন সেই জিহ্বা পুনরায় পীযূষ-বর্ষিণী হয়,—যে দৃষ্টি পূর্ব্বে সূচির ন্যায় তীক্ষ্ণধারে মনুষ্যচিত্তে বিদ্ধ হইত, যখন সেই দৃষ্টি পুনরায় শারদ গগনের চন্দ্রকিরণবৎ মনুষ্যচিত্তে সুস্নিগ্ধ অনুভূত হয়;—যে মনুষ্য পৃথিবীতে পূর্ব্বে পিশাচ কি অসুরের অবতার বলিয়া সকলের ঘৃণা এবং শঙ্কার কারণ হইত, যখন সেই মনুষ্য অশ্রুময়ী মন্দাকিনীর পুণ্যোদকে অবগাহন করিয়া মূর্ত্তিমান্ মঙ্গলের ন্যায় পুনরুত্থিত হয়, তখন স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে দুন্দুভিনাদ হইতে থাকে, প্রীতি হর্ষভরে পুষ্পবৃষ্টি করে এবং সমুদায় মনুষ্যজাতির সম্মিলিত হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করে।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, তোমার মণিমুক্তার মোহনমালা দূরে রাখ ; আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। অশ্রুজলের অসূত্র-গ্রথিত অপূর্ব্ব মালা কণ্ঠে পরিতে পারিলে, কারুকরের কৃত্রিম আভরণে আর প্রয়োজন কি? দয়া যদি নয়নে বহে, ভক্তি অথবা প্রীতি যদি মুখচ্ছবিতে বিলসিত রহে, এবং হৃদয় যদি প্রক্ষালিত ও পরিশোধিত হইয়া প্রসন্ন জ্যোতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে আভরণের আর অভাব কি?

যাঁহারা বীর-ধর্ম্মে অনুরক্ত বীরাচার-পরায়ণ এবং পৌরুষমহিমার উপাসনাই যাঁহাদিগের একমাত্র উপাসনা, তাঁহাদিগের মধ্যে, কাহারও কাহারও অশ্রুবর্ষণে লজ্জা ও অশ্রুদর্শনে ঘৃণা হয়, এবং যাঁহাকে তাঁহারা অশ্রুজলে আর্দ্র দেখেন, তাঁহাকে অকৃতী, অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বলমনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করেন। অহো! মানুষের কি ভ্রম! যেমন প্রকৃত গৌরবান্বিত উন্নত পুরুষেরা বিনয়ে অবনত হইতে লজ্জা অনুভব করেন না, সেইরূপ যাঁহারা প্রকৃত বীর-প্রাণ প্রধান পুরুষ, তাঁহারাও হৃদয়ের উদ্বেলতায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লজ্জিত হন না। বীর-ধর্ম্ম অশ্রুজলের বিরোধী নহে। অশ্রুজলে উহার পুষ্টি,—হায়! অশ্রুজলেই অনেক স্থলে উহার প্রথম সৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

অশ্রু ঝরে কার? যার হৃদয় আছে। মনুষ্য কে? না, যে হৃদয়বান্। যে সাধনা অথবা যে তপস্যায় হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সাধনা অথবা সেই তপস্যায় আবার সিদ্ধি ও ইষ্ট ফল কি? শব্দে শ্রুতি-বিনোদন হয়। কিন্তু হৃদয় ভিন্ন হৃদয়কে জাগাইতে পারে কিসে? মনুষ্য-সমাজ যে সকল ভুবনবিশ্রুত ভয়াবহ বিপ্লবে আমূল বিলোড়িত হইয়াছে,—যে সকল অভাবনীয় বিপ্লব সৃষ্টি ও অসৃষ্টি এবং অন্ধকার ও আলোককে এক করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন গড়িয়া,

মনুষ্যসমাজকে সাধারণের সুখশান্তিময় নূতন মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছে—যাহার অপ্রতিহত প্রভাবে জাতির উৎপত্তি কি জাতির বিলয়, ধর্ম্মের পুনঃসংস্কার, নীতি-শাস্ত্রের পুনঃশোধন, রাজনীতির নূতন গ্রন্থন এবং দীন-দুঃখীর স্বত্বস্বাধীনতার চিরবিদ্বেষিণী দানবী ক্ষমতার বিনাশসাধন-রূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ফল ফলিয়াছে, একীভূত জাতীয় হৃদয়ের অন্তস্তল বিলোড়নই তাহার একমাত্র কারণ; এবং যাঁহারা ঝটিকার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া জাতিবিশেষের হৃদয় বিলোড়নে অগ্রসর হইয়াছেন, বজ্র ও বিদ্যুৎ লইয়া ক্রীড়া করিয়াছেন, বিঘ্নে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন, বিপত্তিকে আদর করিয়া মাথায় তুলিয়াছেন, অথবা আপনার হৃৎপিণ্ডকে হৃদয়গ্রন্থি হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া শক্তির নিকট বলিস্বরূপ উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়বান্। তাঁহাদিগের চক্ষু হইতে দয়ার অশ্রু, ভক্তির অশ্রু, প্রেমের অশ্রু অথবা জাতীয় অনুরাগের উষ্ণ অশ্রু ধারায় বহিয়াছে এবং সেই অশ্রুধারাই জাতীয় হৃদয়ে প্রমত্তবেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর পাপ তাপ ধুইয়া নিয়াছে। ধন্য সেই পবিত্র অশ্রু! ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা পরের জন্য কিংবা দেশ-নির্ব্বিশেষ ও জাতি-নির্ব্বিশেষ মনুষ্যের জন্য ঐরূপে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন।

মা

(১)

[৺অশ্বিনীকুমার দত্ত।]

এ জগতে মার ন্যায় মধুর ও পবিত্র সামগ্রী কিছুই নাই। মা বলিতেই প্রাণে কত পবিত্র ভাবের উদয় হয়। মা সকলের নিকটেই

পবিত্র ভালবাসার আধার। যত মার বিষয় মনে করিবে, ততই অপবিত্র ভাব দূরে যাইবে। মা-নামটি ঐরূপ পবিত্র বলিয়া ভগবান্‌কে মা বলিয়া ডাকিতে যত আনন্দ হয়, তত আনন্দ আর কোন নামেই হয় না। যাঁহার প্রাণে ভগবানের মাতৃভাব সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত থাকে, তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা সরস থাকে, অথচ কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কা থাকে না! জগন্ময় চারিদিকে মাতৃভাবের উন্মেষ হইলে, সমস্ত পৃথিবী পবিত্রতামাখা বলিয়া প্রতিভাত হয়। স্ত্রীলোক দেখিবা-মাত্র যাঁহার মাকে মনে পড়ে, তাঁহার হৃদয়ে আর অপবিত্র ভাব স্থান পাইবে কিরূপে ?

(২)

[৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।]

(চন্দ্রগুপ্তের প্রতি চাণক্য।)

মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে,—এক প্রাণ, এক মন, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল,—তার পর পৃথক্ হ'য়ে এলে,—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত মা—যে তাঁর দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে, স্নেহের উত্তাপে জ্বাল্ দিয়ে সুধা তৈরি ক'রে পান করিয়েছিল, যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশীষ-চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষঃ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখ্‌বার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিনী এই শুষ্ক-তপ্ত মরুভূমিতে

শত ধারায় উচ্ছলিত হ'য়ে যাচ্চে ; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানব-জীবনে প্রভাতসূর্য্যের কিরণ দেয়, বিতরণে কার্পণ্য করে না, প্রতিদান চায় না ; উন্মুক্ত, উদার, কম্পিত আগ্রহে দু'হাতে আপনাকে বিলা'তে চায়, এ—সেই মা।

(৩)

[কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।]

সন্তানের চক্ষে মায়ের ন্যায় সুদৃশ্য বস্তু আর নাই, সন্তান মায়ের বাহ্যরূপ দেখিতে পায় না। সে অন্তশ্চক্ষু দ্বারা মায়ের যে স্বর্গীয়রূপ আছে, তাহাই দিবারাত্র দেখিতে পায়। সেই জন্যই মা সুশ্রী, কি কুৎসিত তাহা অন্যে বাহ্যচক্ষুতে দেখে বটে, কিন্তু সন্তান তাহা দেখিতে পায় না। মা আমার সুন্দরী, কি, মা আমার কুৎসিতা, ইহা কোন ছেলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় না। সন্তানের মা-দেখা চক্ষু আলাদা। অন্তশ্চক্ষু দ্বারা যত সুদৃশ্য বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, মা তাহাদের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। মা,.........আমার মঙ্গলের জন্য তুমি যে বক্ষঃস্থল চিরিয়া দেবতাকে বহুবার রক্ত দিয়াছ, সেই ক্ষতচিহ্নিত বক্ষঃ ও স্বর্গের হাসি-মাখা মুখের নিকট সমস্ত সুদৃশ্যকে হার মানিতে হয়।

(৪)

[শশাঙ্কমোহন সেন।]

ভাগীরথীর অমৃতস্তন্যপরিপুষ্ট বাঙ্গালী জগতে একটি কথা বিশেষ ভাবে চিনিয়াছে—'মা'। ভারতের কোন জাতি চিনিয়াছে 'জয়

সীতারাম' কোন জাতি চিনিয়াছে 'জয় হর হর শম্ভো' বাঙ্গালী চিনিয়াছে 'মা'। মাতৃভাবের উপাসনায় উদ্দীপনায় এত কাব্য কবিতা, এত হৃদয়-গাথা আর কোন ভাষায় রচিত হইয়াছে কি না জানি না। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্যযুগে, ইয়োরোপে—বিশেষতঃ ইটালীতে মাতৃ-ভাবের অবলম্বনে রাফেল প্রভৃতি কয়েক খানি জগৎপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন; মেরী-মাতাকে অবলম্বন করিয়া ইয়োরোপের মধ্যযুগে কিছু কিছু ভক্তিসাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার তুলনায় তাহা সামান্য।

'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'কে জ্ঞাতসারেই বহু ভাবে দর্শন এবং আরাধনা সমগ্র হিন্দুজাতির বিশেষত্ব, পুনশ্চ উহাঁকে মাতৃভাবে এবঞ্চ তনয়ার ভাবে দর্শন এবং উপাসনা বিশ্বধর্ম্মের মধ্যে কেবল বাঙ্গালীরই বিশেষত্ব। মা-নাম অপেক্ষা বৃহৎ, মহৎ, অথবা মধুমৎ শব্দ-পদ বাঙ্গালা ভাষায় নাই, জগতের অন্য ভাষায় আছে বলিলে বাঙ্গালী তাহা বিশ্বাস করিবে না। তাহার ধর্ম্মে সমাজে পরিবারে ও দেশে—ইহকাল ও পরকালে এই মাতৃভাবের ও মাতৃপূজার অক্ষুণ্ণ রাজত্ব।

(৫)

[কালীবর বসু]

বালেন্দুশোভিতা সন্ধ্যাসতীর ন্যায় নারী তখনই সুন্দরী, যখন তাঁহার অঙ্কশোভা সম্পাদন করিয়া শিশু আহ্লাদে হাসিতে থাকে। গৌরী—কিশোরী,—যতই সুন্দরী হউন—অপূর্ণা নারীমূর্ত্তি; পরিপূর্ণা মূর্ত্তি—গণেশজননী। জননী—গর্ভধারিণী—সন্তান প্রসব করিয়াই জননী।

আর মা,—সেই পিণ্ডের প্রতিপালিকা, পরিতোষিকা। কেবল সন্তানের পোষণ তোষণেই মাতার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় না। যাদুকর যেমন মন্ত্রবলে অচেতনকে সচেতন, জড়কে জঙ্গম করিয়া দেখায়, সেইরূপ মা সন্তানের প্রতি অঙ্গে প্রতি ইন্দ্রিয়ে যেন অদ্ভুত যাদুবলে সঞ্চারিণী বিদ্যা দান করিয়া সেই পিণ্ডবৎ পদার্থটিকে গতিমান্, চঞ্চল, কর্ম্মব্যস্ত করিয়া তোলেন। পরন্তু সন্তানের বৃদ্ধি ঋদ্ধি সমস্তই মাতার যত্নে, মাতার সাধনায়। মা-ই অন্ধকারগৃহে দীপদানের ন্যায় ঐ পিণ্ডের অভ্যন্তরে জ্ঞানের প্রথম বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করেন।

আহা, মার কোল কি নির্ভয় স্থান! কি নিরাপদ্ দুর্গ! যে শিশু ভূতলে অবস্থিত থাকিলে ক্ষুদ্র পোকাটি পর্য্যন্ত দেখিয়া ভয় পায়; সেই কিনা মাতৃ-অঙ্কে আরূঢ় হইয়া সিংহ শার্দ্দূলেরও কান মলিয়া দিতে ভীত হয় না। মাতৃত্বের মহাপারাবার অজস্র আবেগে উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতেছে। মার মুখ সন্তানের কল্যাণাশীষে সতত মুখরিত, মার বুক সন্তানস্নেহে সতত সঞ্জীবিত, মার কর্ণ অপত্যের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে সর্ব্বদা লালায়িত; মার চক্ষুঃ পুত্রকন্যার জয়শ্রী দর্শনে নিত্য বিস্ফারিত। মাতৃত্বের উপলব্ধি মানববুদ্ধির অনধিগম্য।

মানব ত্রিমাতৃসেবক। ত্রিমাতা—গর্ভধারিণী, জন্মভূমি, জগজ্জননী,—ভক্তিসূত্রে গ্রথিত তিনটি মণি। ইহাঁদের কেহ অপর অপেক্ষা হেয় বা উপাদেয় নহেন। মাতৃত্বের গৌরবে সকলেই সমান গরীয়সী মহীয়সী। স্বগর্ভজাত সন্তানে গর্ভধারিণী মাতার যে মাতৃত্ব, স্বীয় অঙ্কগত অধিবাসিগণে জন্মভূ-মাতার সেই মাতৃত্ব, এবং বিশ্ববাসিজনে বিশ্বজননীর তদনুরূপ মাতৃত্ব। সন্তানসংখ্যার আধিক্য বা অল্পতায় মাতার মাতৃধর্ম্মের ইতর বিশেষ হয় না। মানব ত্রিমাতৃক বলিয়া কোন মাতা তাহার বিমাতা নহেন। পরন্তু মাতৃত্রয়ের একাত্মতা এত নিবিড় যে,

একের সেবায় অন্যের সেবা, একের অনাদরে অন্যের অনাদর। মানুষ, যদি সৎ হইতে চাও, সুন্দর হইতে চাও, মহৎ হইতে চাও, মধুময় হইতে চাও, মাতৃ-চরণে আত্মনিবেদন কর।

মা—জগৎপালিনী বিষ্ণুশক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, মা—ভুবনমোহিনী রাজরাজেশ্বরীর পরিদৃশ্যমান বিগ্রহ: আহা 'মা' নামে পবিত্রতা কত! কুচিন্তাপিশাচী তোমার হৃদয় অশুচি করিতে চাহিতেছে? সন্তান, একবার 'মা' বলিয়া ডাক, পিশাচীর আশঙ্কা দূর হইবে। 'মা' নামের মঙ্গলময়তাই বা কত! তুমি কোন সঙ্কটসঙ্কুল স্থানে যাইতে শুভলগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছ? কেন? তোমার কি মা নাই?—নাই থাকুন, বিশ্বাসী সন্তান, হৃদয়ে মার স্মৃতি জাগরূক কর, মার মূর্ত্তি ধ্যান কর, মা-মা-মা বলিয়া যাত্রা কর, কোন সঙ্কট তোমার নিকটে আসিতে পারিবে না। আর মা যদি বিদ্যমান থাকেন, ভাগ্যবান্ সন্তান, মার পদরজঃ—রক্ষাকবচ মস্তকে ধারণ করিয়া রণে বনে—যেখানে ইচ্ছা নির্ভয়ে অভিযান কর, বিপৎ তোমার কেশস্পর্শেও সমর্থ হইবে না। গৃহে যার মঙ্গলঘট স্থাপিত, মা যার কুশলস্বস্ত্যয়নে নিয়ত নিরত, তার যদি বিপদ্, তবে সংসারে সম্পদের অধিকারী কে?

শরশয্যাশায়ী বীরবর ভীষ্মের তৃষ্ণাহরা শুভ্র ভোগবতীধারার ন্যায় নিখিল বিশ্বের তাপতৃষ্ণা হরণ করিতে মাতার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে অজস্র শীতল স্নেহস্বচ্ছ পবিত্রধারা উৎসারিত হইতেছে। এ সঞ্জীবনী সুধার সমান বস্তু জগতে আর কি আছে? মরুতে তরু জন্মাতে, পঙ্কে পদ্ম ফু'টাতে কোন্ মহোদধির মন্থনে এ অমৃতের উদ্ভব! জীব, চিরদিন শিশু থাক, যতদিন বাঁচিয়া থাক, এ সুধা প্রাণ ভরিয়া পান কর, সকল ক্ষুধার শান্তি হইবে। স্বর্গের সুধা লইয়া দেবাসুরে বিবাদ ঘটিয়াছিল, ধন্য এ মর্ত্ত্যের সুধা! এ সুধায় দেব দানব রাক্ষস মানব কাহারও

বিচার নাই, এ সুধা ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, ইতর ভদ্র সকলে সমান পরিতোষে উপভোগ করিতে পায়।

মার মত স্বেচ্ছার—সহজ আকুল ইচ্ছার দাসীই বা কে? মা দেবীত্বে বড়, না দাসীত্বে বড়, ঐশ্বর্য্যে বড়, না মাধুর্য্যে বড়; ভোগে বড়, না ত্যাগে বড়—এ তত্ত্বের মীমাংসা করিবে কে?

শিশু যখন মার মুখ দেখিতে দেখিতে হাসে অথবা হাসিতে হাসিতে দেখে, আর চাঁদ দেখিবার অছিলায় একবার চাঁদের পানে, একবার মার মুখপানে সকৌতুকে তাকায়, এবং দু'চারিবার এইরূপ করিয়া মার বুকে আপন মুখ লুকায়, তখন কি শিশু স্পষ্ট করিয়া বলে না?—"চাঁদ, তুমি যতই সুন্দর হও. আমার মার মুখের তুলনা নাই।"

হায়! এ বয়সে শিশুকালের সেই সরল পবিত্র দৃষ্টি হারাইয়া বসিয়াছি। তথাপি বলিব—"মা আমার রম্যা, রম্যতরা, অশেষ রমণীয়া, মা আমার অতি সুন্দরী।"

(৬)

[মানকুমারী বসু।]

"মাতার ন্যায় ছায়া আর নাই, মাতার ন্যায় আশ্রয় আর নাই, মাতার ন্যায় রক্ষা আর নাই, মাতার ন্যায় প্রিয়াও আর নাই। আমরাও বুঝিতে পারি, মাতার ন্যায় ত্রিতাপনাশিনী দেবতা আর নাই! এ সংসারে সুখের দিনে যেমনই হউক, দুঃখের দিনে মহাপাপীও ভগবান্‌কে একবার মনে করে। সেইরূপ সৌভাগ্যের সময়ে যাহাই হউক, দুর্ভাগ্যের সময়ে অতিবড় কৃতঘ্ন সন্তানও 'মা' বলিয়া নিশ্বাস ছাড়ে। তাই রোগী রোগযাতনায়, ভীরু বিভীষিকায়, সকল ব্যথিতেরাই ব্যথার

সময়ে 'মা' বলিয়া আর্ত্তনাদ করে। ভগবান্‌কে ডাকিলে মহাপাপীর পাপের যন্ত্রণা যেমন জুড়ায়, মাকে ডাকিলে বড় দুঃখীরও দুঃখের জ্বালা সেইরূপই জুড়াইয়া থাকে। মানব রোগী হউক, শোকী হউক, শিশু হউক, বৃদ্ধ হউক, বড় ব্যথার সময়ে সে 'মা' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিবেই। কুসন্তান হইলেও সেই মাতৃ-স্মরণে তাহার আত্মা এক পলকের জন্য পরিতৃপ্তি লাভ করিবেই। তাই বলিতেছি মায়ের মত অমৃতময়ী দেবতা যেমন এ জগতে আর নাই, 'মা' শব্দের মত অমৃতময় শব্দও সেইরূপ ভাষায় আর নাই। মানব শিশু-জীবনে প্রথমে 'মা' বলিতে শিখে, প্রাপ্তবয়সে মাকে সম্বোধন ভিন্ন আত্মতৃপ্তির লালসাতেও প্রতিদিন অগণ্যবার 'মা' 'মা' করে, মুমূর্ষু মানবও বুঝি তার শেষ নিশ্বাস 'মা' বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু এত বার ব্যবহৃত হইলেও 'মা' শব্দ সন্তানের প্রাণে চিরদিনই নূতন। 'মা' উচ্চারণ করিলেই সন্তান-হৃদয়ে নব বল, নবোৎসাহ, নবস্ফূর্ত্তি, নবজীবনী সঞ্চারিত হয়। শুনিয়াছি অমৃত পান করিয়া কাহারও পরিতৃপ্তি জন্মে না—এ বিষয়ে সত্যতা জানিতে মর মানবের উপায় নাই, কিন্তু মাকে ডাকিয়া ডাকিয়া সন্তানের পরিতৃপ্তি কখনও হয় না, ইহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। এজগতে মাতৃ-স্নেহ যেমন অমৃত, মাতৃ-স্তন্য যেমন অমৃত, মাতৃ-ক্রোড় যেমন অমৃত, মায়ের আদর যেমন অমৃত, 'মা' বলিয়া ডাকাও সেইরূপ অমৃত। 'মা' বলিলেই সন্তানের বুকে অমৃত-স্রোত বহে। এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিয়াই হিন্দুসম্প্রদায় জগদীশ্বরকে 'দুর্গা' 'কালী' 'জগদ্ধাত্রী' প্রভৃতি মাতৃমূর্ত্তিতে পূজা করিয়াছেন। জগদীশ্বরকে 'বিধাতা' বলিয়া জানিলে যাহার হৃদয় শুষ্ক থাকে, 'মা' বলিয়া জানিলে তাহার হৃদয় ভিজিয়া যায়। এইজন্য মাতৃমূর্ত্তিতে ভগবানের উপাসনা হয়।

যেমন বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা অসম্ভব, সেইরূপ

মাতৃভক্তি ছাড়িয়া ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন অসম্ভব। মাতৃভক্তিই ভক্তি-ভাবের বর্ণমালা। প্রত্যেক সন্তান ইহা বুঝিয়া মাতৃভক্তি বিকাশ করিবেন। মাতার মহত্ত্ব ও দেবত্ব স্মরণ করিয়া মাতাকে জগদীশ্বরের অংশ দর্শন করিবেন; বিনীত ও প্রফুল্লভাবে মাতৃ-চরণ বন্দনা, মাতার সেবাশুশ্রূষা এবং মাতৃহিতসাধন করিবেন। এ জগতে মাতৃ-ঋণ অপরিশোধ্য, তবে মাতৃভক্ত হইলে, প্রত্যেক সন্তানের ঐহিক, পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইবে। ভগবতী বিশ্বজননী তাঁহার স্নেহের হস্ত সম্প্র-সারণ করিয়া মাতৃভক্ত সন্তানকে সর্ব্বদা নিজের অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান-দান করিয়া থাকেন।

জ্ঞানের সাধনা।

[আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।]

[প্রফুল্লচন্দ্র রায়, খুলনার অমূল্য রত্ন,—এ রত্ন সমগ্র ভারতের, কেবল ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর বড় যত্নের ধন। কি আশ্চর্য্য! সমগ্র পৃথিবীর গৌরব লাভ করিয়াও প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের, স্বগ্রামবাসিনী জালজীবি-পত্নী বা নমঃশূদ্র-কন্যাদিগকে 'মাসী' 'পিসী' ডাকিয়া তাহাদের হাতে মুড়ি মুড়্কি চাহিয়া খাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সংসার নাই, সমাজ নাই,—তাই বুঝি সমগ্র বঙ্গ আজ তাঁহার সমাজ; বাঙ্গালার প্রতি পল্লী তাঁহার সংসার। প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বিতীয়টি এযুগে দুর্লভ।

এই চিত্তজয়ী চিরকুমার কর্ম্মবীর রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় ব্রতী থাকিয়া বা র্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; এখনও দাতাকর্ণ—তারক-রাসবিহারীর দানে প্রতি-ষ্ঠিত 'বিজ্ঞান কলেজে'র অবৈতনিক অধ্যক্ষপদে বৃত আছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায়

মনস্বী, মহাপ্রাণ, পরদুঃখকাতর মহাপুরুষ দুর্লভ। সাতক্ষীরার দুর্ভিক্ষে, উত্তরবঙ্গের ভীষণ প্লাবনে ইনি অন্নবস্ত্রাদিদানে সহস্র সহস্র লোকের জীবন রক্ষা করিয়া অমর হইয়াছেন। অধুনা ইনি দরিদ্র বঙ্গের অন্নবস্ত্রের সমাধানে জীবন পণ করিয়াছেন। এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বঙ্গের বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র ইংরাজীতে হিন্দুরসায়নের ইতিহাস লিখিয়া অতুল যশের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র কেবল বৈজ্ঞানিক নহেন, ইঁহার রচনায় বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে ইঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে দেশের যাবতীয় সদনুষ্ঠানে ইঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। ইঁহার প্রণীত "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' ইহাঁর মহৎ হৃদয়ের মহোচ্চ উচ্ছ্বাস। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ভাবিবার ও বুঝিবার কথা অনেক আছে। 'জ্ঞানের সাধনা' প্রবন্ধটি উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত। ইহার ভাষা প্রাণময়, মহাভাবে পরিপুষ্ট, হৃদয়বত্তায় বলিষ্ঠ, প্রাণের আবেগে জীবন্ত, মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী।]

বর্ত্তমান অবস্থায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ যাঁহারা যথার্থই কর্ম্মক্ষম হইতে পারিতেন, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াই তাঁহারা চাকরীর অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, সামান্য ২০।২৫ টাকার মসীব্যবসায়ী হইয়াও অর্দ্ধানশনে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত কালযাপন করিতে পারিলে কৃতার্থ হন। বস্তুতঃ এই সকল হতভাগ্য তরুণবয়স্ক যুবকবৃন্দের আজীবনব্যাপী ক্লেশের জন্য সমাজ দায়ী। কিশোর বয়স অতিক্রম না করিতেই শিক্ষার ও জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রবেশমার্গে উপস্থিত না হইতেই, ভালমন্দ দায়িত্ব ইত্যাদির সম্যক্ উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বেই পরিণয়ের কঠোর নিগড়ে বাঁধিয়া, যুবকবৃন্দের ভবিষ্যৎ-আকাশ গভীর কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত করিয়া বসেন। আশার ক্ষীণালোক সমুদ্রবক্ষস্থিত আলোক গৃহের (Light House) ন্যায় সংসারকাননের বিহঙ্গ, তরুণবয়স্ক যুবকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে যে মহৎ ভাবসকল শিক্ষার প্রভাবে

প্রস্ফুটিত করিতেছিল, যে আলোকমালা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন ও সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, দারিদ্র্যময় পরিণীত জীবনের বিষম বাত্যা-সংঘাতে হায়, সে আলোক নিবিয়া গেল, সংসারসাগরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার প্রবল উর্ম্মিমালার তাড়নায়—ততোধিক সমাজের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে যুবকের জীবনতরি ডুবিল! যে দেশের সমাজ উত্থানপ্রয়াসী যুবকবৃন্দের মস্তকে এইরূপ লগুড় আঘাত করে, সে দেশের যুবক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া জীবিকা জীবিকা করিয়া ছুটিবে, তাহা বিচিত্র কি? সে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ব্যাধি হইবে ইহাই ত স্বাভাবিক।

হায়, যে দেশে অর্থ ক্রৌমি-কীট বলিয়া পরিগণিত হইত, যে দেশের নিষ্কাম জ্ঞানার্জ্জনই আজীবনব্যাপী কর্ম্ম ছিল, যে দেশের তপোবনে বিহঙ্গকলকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দের ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের আবৃত্তির স্বর কাননভূমিকে মুখরিত করিত, সেই দেশে আজ বিদ্যার্জ্জন মসীবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের উপায়মাত্র! আমরা পাশ্চাত্ত্যদেশীয়দিগকে অর্থো-পাসক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, উহা জম্বুকীর দ্রাক্ষাফলে অনভিরুচির ন্যায়, অথবা দুর্ব্বলের ক্ষমাশীলতার ন্যায় উপহাসের বিষয় মাত্র।

বাল্যকাল হইতে যে দেশের যুবক পিতামাতা গুরুজনের নিকট রৌপ্যখণ্ডের মধুর নিনাদের বার্ত্তা শুনিয়া আইসে, যে দেশের বিবাহ ক্রয়বিক্রয়ের নামান্তর মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে দেশের ভর্ত্তার ভাল-বাসা শ্বশুরপ্রদত্ত বিত্তের পরিমাপকস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহাই যে দেশের সমাজের ছবি—সে দেশে আদর্শ আধ্যাত্মিক বলিয়া যদি কোন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা পণ্ডিত অথবা সমাজের নেতা গর্ব্ব করেন, জানি না পিশাচবৃত্তি কাহাকে বলে! বাস্তবিক বাঙ্গালীর ন্যায় অর্থো-

পাসক জাতি আর কুত্রাপি নাই। ইংলণ্ড, জর্ম্মনী, ফ্রান্স আজ ঐশ্বর্য্যশালী সন্দেহ নাই; বাণিজ্য শতধারে ঐ সকল দেশে সম্পদ্‌রাশি ঢালিতেছে বটে, কিন্তু এই অর্থাগমসত্ত্বেও জ্ঞানস্পৃহার কিছুমাত্র হ্রাস পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ উহাঁরাই সরস্বতীর প্রকৃত উপাসনা করিতেছেন। অনন্যমনে জ্ঞানান্বেষণই যেন উহাঁদের অর্থলাভের হেতু বলিয়া অনুমিত হয়। এই জ্ঞানান্বেষণের ফলে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া, প্রকৃতির শক্তি-সাহায্যে পাশ্চাত্ত্যদেশবাসিগণ পার্থিব জগতে যুগান্তর উপস্থিত করণে সমর্থ হইয়াছেন। আর আমাদের মৃতকল্প স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণ—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিও আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ, সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে; তাঁহারা এ কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যা-বর্ত্তন করি।

সাধারণের উন্নতি।

[৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার।]

[৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার—বঙ্কিম-চক্রের লেখক, সুনিপুণ সমালোচক ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় বঙ্গসরস্বতীর একনিষ্ঠ সেবক আর দেখা যায় না। ইহাঁর পিতার নাম ৺গঙ্গাচরণ সরকার; প্রতিভাশালী পিতার প্রতিভাশালী পুত্র অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে পিতা পুত্রের বিস্তৃত বিবরণ নিজের হাতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইনি একই সময়ে 'নব জীবন' ও 'সাধারণী' দুইটি মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' ও কালীপ্রসন্নের 'বান্ধবে'র ন্যায় অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবন' ও 'সাধারণী'ও বঙ্গের নবীন জীবন গঠনে প্রচুর উপাদান যোগাইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনায়ই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহাঁর সরল সরস ভাষায় বিশুদ্ধ হাস্যরস বড় মিষ্ট। অতি গুরু বিষয়ও ইনি যেমন কৌতুকরসে সিক্ত করিয়া মধুর ও মনোহর করিয়া তুলিতে পারিতেন অতি অল্প লেখকই তেমন পারেন। অক্ষয়চন্দ্র ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেও পাশ্চাত্য ভাবে বিন্দুমাত্র অভিভূত হন নাই। ইনি খাঁটি হিন্দুপ্রাণ ছিলেন এবং চিরদিন ভূদেব বাবুর ন্যায় ভারতীয় আর্য্য-নীতির ভক্তিনত চিত্তে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।]

কোন একটি দেশে কেবল ঊর্দ্ধতন শ্রেণীর জনকতক লোকের জ্ঞানার্জ্জনে, ধনসঞ্চয়ে বা বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার বা সুবিধা থাকিলে, সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সে শ্রী অধিক দিন থাকে না। মনু বলিয়াছেন যে, যে পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পায়, সে পরিবারমধ্যে কখনও লক্ষ্মী থাকে না। আমরাও সেইরূপ দেখিতেছি যে, যে দেশের সাধারণ লোক সকল অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন থাকে, সে দেশের ক্রমোন্নতি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ সামাজিক নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বহুকালব্যাপী গভীর চিন্তা

দ্বারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। দায়ক্রম, বিবাহ, ব্যবহার, বিচার, প্রজাপালন প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সে সকল অপেক্ষা ভাল নিয়ম এখনও মানবের বুদ্ধির গোচর হয় নাই। কেবল এই একটি বিষয় অবহেলা করাতেই সেই মহাত্মগণের গঠিত এই বিপুল প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অট্টালিকার প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ, শীর্ষ, সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভিত্তিতে যে মহৎ দোষ ছিল, তাহা সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই। নিম্নস্তরের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ক্ষয় হইলে, হলধারী বৈশ্যে, বা দ্বিজসেবক শূদ্রে সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিল না। সেই বার ভারতে আর্য্যজাতির প্রথম পতন। নিম্নস্তরের উত্থানশক্তি ছিল না বলিয়া, শূদ্রবৈশ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্তির অধিকার ছিল না, ক্ষমতা ছিল না, তাহাতেই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।

তবে যে ভারতবর্ষে 'উন্নতি উন্নতি' বলা যায়, সে কেবল ছাদের কার্ণিশের পারিপাট্য মাত্র; তলেতে ভিত্তিতে সেই পূর্ব্বের মত বাজারু ইটের কাঁচা গাঁথুনি আছে, এবং বহুকালের গাঁথুনি বলিয়া এখন লোণা লাগিয়াছে, কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ফাটিয়া রহিয়াছে। তখন যেরূপে আর্য্যভূমি অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও আমরা সেই পাপে লিপ্ত। এখনও আমরা অনেকে মনে করি যে, ছোট লোকের ঘরে পয়সা হইলে কিংবা গায়ে বল থাকিলে, অথবা লেখাপড়া শিখিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এ ভ্রম যতদিন থাকিবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই।

ছোট লোকের বাড় হউক, ঘরে পয়সা, মরায়ে ধান, গায়ে বল থাকুক, লেখাপড়া শিখুক, আর ভদ্রসন্তানের অবস্থা হীন হউক, এ ইচ্ছা কাহারও

নাই। আমরা বলি—সাধারণ লোককে অজ্ঞ, মূর্খ, নিঃস্ব রাখিয়া আমরা বড় থাকিতে চাহি না। দশ হাজার কুটীরবাসী ধাঙ্গড়ের মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ পোদ্দার হইয়া থাকা ভাল, না যেখানে পঞ্চাশ ঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ আছে, পঞ্চাশ ঘর চাকুরে কায়স্থ আছে, কারকারবারি শাঁসেজলে পাঁচ হাজার ঘর নবশাখ আছে, সেকরায় সোনারূপার কারবার করিতেছে, কামারে তলোয়ার খাঁড়া তৈয়ার করিতেছে, কাঁসারিতে ঢালাই গলাই করিতেছে, জেলে বাগ্দী মাছ ধরিয়া চালানি দিতেছে, সকলেরই ঘরে দু' পয়সা দু' সিকি আছে, আর সকল জাতির মধ্যেই পাঁচ সাত জন লেখাপড়া জানে অর্থাৎ চিঠি লিখিতে পারে, হিসাব রাখিতে জানে, এবং বিল-কবজ পড়িতে পারে, এরূপ স্থানে থাকা ভাল? আমাদের বিবেচনায়, অসভ্য ধাঙ্গড়ের মধ্যে প্রভুত্ব করা অপেক্ষা এরূপ সমাজে অল্পকষ্ট সহ্য করিয়া বাস করা শতগুণে শ্রেয়স্কর। ধাঙ্গড়ের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইলে, ক্রমে ধাঙ্গড় হইতে হয়, প্রমাণ বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি। যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশের সমাজের পতি, তিনি এইখানে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির বল পান নাই বলিয়া, ক্রমে অধঃপতিত হইয়া নিস্তেজ নিবীর্য্য এবং তমসাচ্ছন্ন। সমাজের নিম্নস্তরে সকলের সম্প্রসারণ-শক্তি না থাকিলে, ঊর্দ্ধতন শ্রেণীর উন্নতি কখনও স্থায়ী হইবে না, সময়ে সময়ে অধঃপতন হইবেই হইবে।

সাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ সাধারণকে তাহাদের আপনার কথা ভাবিতে শিখান উচিত। যে আপনার ভাবনা ভাবে না, তাহার ভাবনা আর পাঁচজনে ভাবিয়া কি করিবে? আমাদের দেশে সাধারণ লোকের দুঃখের ভাবনা সকলেই ভাবে, কিন্তু সে কেবল নিজের বা নিজ পরিবারের জন্য। সকলে মিলিয়া সকলের জন্য ভাবিতে

প্রায় জানে না। সকল শিক্ষার আদি, মধ্য, অন্ত,—শিক্ষার সার হই-তেছে—পরের ভাবনা ভাবিতে শিখা। যাহার এ শিক্ষা নাই, সে শিক্ষিত নহে। যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শিখেন নাই, তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। এই শিক্ষা আছে বলিয়াই ইউরোপের উন্নতি, এবং আমেরিকার অত্যুন্নতি। এই শিক্ষা নাই বলিয়াই আমাদের দেশের এত অবনতি। এই শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা সহজে পাওয়া যায়। তুমি যদি আমার ভাবনা ভাবিতে থাক, তাহা হইলে আমি তোমার ভাবনা অবশ্য ভাবিব; আর মধ্যে মধ্যে আরও পাঁচ জনের জন্য ভাবিতে শিখিব; আমি যদি আরও দশজনকে আমার ব্যথার ব্যথী হইতে দেখি, তবে ক্রমে আমিও সেই কয় জন ছাড়া আরও দশজনের ব্যথা বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশে শিক্ষাদোষে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ লোকের ব্যথার ব্যথী লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণের একে শিক্ষা নাই, তাহাতে দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় না, কাজেই পরস্পরের বেদনা পরস্পরে বুঝিতে পারে না।

যতদিন উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত নিম্নস্তরের এই অসংখ্য প্রাণীর সহানুভূতি না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

যাঁহারা সাধারণের জন্য বেদনা বোধ করে না, তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া মত পরিবর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলি, যাঁহারা বাস্তবিক সাধারণের অবস্থা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন, তাঁহাদের মনের ভাব যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন তাহার চেষ্টা করেন; এবং কার্য্যতঃ সেই মনের ভাব ব্যক্ত করেন।

আজি কালি অনেকে সাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইাছেন। যাহাতে সাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাধারণের শিক্ষা দিবার কথাবার্ত্তা উঠিয়াছে, বড় আহ্লাদের কথা!

মানব-জীবনে দুঃখ-বিপত্তির উপযোগিতা

[৺শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।]

[চৌধুরী মহাশয় বঙ্কিম-যুগের লোক। ঐশ্বর্য্যময়ী ভাষায় যুক্তিমূলক প্রবন্ধ-রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। ইনি কোন বিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জনের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেন নাই সত্য, কিন্তু ইঁহার লেখনীপ্রসূত বিদ্যালয় পাঠ্য 'সাহিত্য-সোপান' 'সাহিত্য-পরিচয়' 'সাহিত্য-সন্দর্ভ' প্রভৃতি গ্রন্থ যিনি পাঠ করিয়াছেন তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শরৎ বাবু বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচনাশক্তি অদ্ভুত ; রচনা যেমন প্রাঞ্জল তেমনই মর্ম্মস্পর্শিনী। বস্তুতঃ ইঁহার ভাষার মাধুর্য্য, ভাবের ঔদার্য্য এবং যুক্তি-প্রয়োগ-নিপুণতা দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। উক্ত প্রবন্ধটি শরৎ বাবুর 'সাহিত্য-সন্দর্ভ' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।]

ভূমণ্ডল সুখময় কি দুঃখময়? কবির লীলাময়ী লেখনী এ পূর্ব্ব-পক্ষের পরস্পর পরিপন্থী নানারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। কবিগণ অনেক সময় সাময়িক ভাবের আবেগে নিয়ন্ত্রিত হন; তাই তাঁহারা কখন বলিয়াছেন—এ সংসারে বৃথা জন্ম এ কথা বলিও না; ভবধামকে দুঃখের স্থান কখন মনে করিও না; ইহার চারিদিকে কেবলই সুখের কার্য্যক্ষেত্র এবং আনন্দের ক্রীড়াকানন।

পরক্ষণে বলিয়াছেন,—পৃথিবী নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়; সুখ যাহা শুনিয়াছ, তাহা কথার কথা; আকাশ-কুসুম, মুক্তার লতা, জীবনের মৃগ-তৃষ্ণিকা মাত্র। কিন্তু, কবির সাক্ষ্যে সত্য নির্ণয় করিতে গেলে বিচারবিভ্রম উপস্থিত হইবে। কবিগণ বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও ভাবের উদ্দীপনাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। আমরা সর্ব্বত্র কবির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিব না।

আলোক এবং অন্ধকার, সুখ এবং দুঃখ সংসারে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। নিরবচ্ছিন্ন দিবালোক অথবা নিরবচ্ছিন্ন রজনীর অন্ধকার কাহারও চিরভোগ্য নহে। সেইরূপ এমন সৌভাগ্য-শালীও কেহই নাই, যিনি কেবলমাত্র সুখের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে পারিয়াছেন, অথবা এমন মন্দভাগ্যই বা কে আছে যে কেবলমাত্র দুঃখের দাবদাহে চিরকাল অবিচ্ছেদে দগ্ধ হইয়াছে। যিনি বলিয়াছেন—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" তিনিই যথার্থ কথা বলিয়াছেন। অপার্থিব মাধুরীমণ্ডিত সুখ বিবিধ মনোরম উপায়ন সঙ্গে লইয়া তোমার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, তুমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে চির-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলে, কিন্তু হয় ত দেখিতে পাইবে, তোমার হস্ত সংযত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছেন। দুঃখের মর্ম্মঘাতী কঠিন দংষ্ট্রা প্রাণে বিদ্ধ হইয়া হলাহলপ্রবাহে তোমাকে উদ্বেলিত করিয়াছে। ধৈর্য্য ধারণ কর, ক্ষণকাল পরেই সেই বিষক্ষতে শান্তিসুধা প্রলিপ্ত হইবে এবং সকল যন্ত্রণার তিরোধান হইবে।

পৃথিবী এইরূপ সুখদুঃখ-সমন্বিত হইলেও ইহাতে সুখেরই প্রাচুর্য্য।

প্রকৃতি স্বয়ং হাস্যময়ী সুখময়ী। তিনি উদারপ্রাণে মানবের জন্য সুখের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন, মনুষ্য গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইতে পাবে

যিনি প্রাতঃসূর্য্যের হৈম প্রভায় জগৎকে হাসিতে দেখিয়াছেন, উষা ও প্রদোষের মৃদুবাতপ্রবাহে মন্দান্দোলিত-লতার কুসুমহাসি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ক্রীড়াশীল বালকবালিকার সরল মুখমণ্ডলে পবিত্র হাস্যলহরীর লীলা অবলোকন করিয়াছেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডিত শারদীয় নভোমণ্ডলের মনোহর শোভা সম্ভোগ করিয়াছেন, পরদুঃখে আত্মোৎসর্গী মহাত্মার আবেগপূর্ণ গভীর আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত আরও সহস্র সুখ সৌন্দর্য্যের অমৃতধারার আস্বাদ পাইয়াছেন,—তিনিই জানেন পৃথিবী সুখের স্থান কি দুঃখের স্থান।

যাহা হউক, যদিও সংসারে সুখেরই প্রাচুর্য্য, অথচ দুঃখও অপরিহার্য্য, তথাপি দুঃখের আকাঙ্ক্ষা কেহই করে না। কিন্তু, দুঃখ কামনার বস্তু না হইলেও মনুষ্যজীবনে উহার প্রচুর উপযোগিতা রহিয়াছে। দুঃখবিপত্তি অনেক সময়ে আমাদিগের হিতৈষী বন্ধু।

দুঃখ সুখের মানদণ্ড। দুঃখ না ভুগিলে সুখের মাধুরী সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। কৃষ্ণপক্ষের তামসী নিশার পরিবর্ত্তে শুক্লা যামিনীতে যেমন চন্দ্রকলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ানন্দ কলায় কলায় বর্দ্ধিত হয়, রজনী চিরকৌমুদীময়ী হইলে তেমন হওয়া অসম্ভব হইত। দুঃখবিপত্তির অবসানে সুখের উপকরণগুলি যেরূপ চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয়, চিরসুখীর চিরাভ্যস্ত সুখরাশি কখনই সেরূপ প্রীতিকর হয় না।

দুঃখ মানবজীবনের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিবার সুন্দর কৌশল।

মনুষ্য সুখে অতিমাত্র উদ্দাম ও বিহ্বল হইয়া পড়িলে, সমাজের নানা বিভ্রাট্ ঘটিবার সম্ভাবনা। দুঃখ অথবা দুঃখবিপত্তির আশঙ্কা তাহাকে সাম্যাবস্থ রাখিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করে।

দুঃখবিপত্তির অধিকাংশই আত্মকৃত পাপফলে সঞ্জাত, কিয়দংশমাত্র দৈবায়ত্ত। আমরা সংসারপ্রপঞ্চে মোহিত হইয়া যখন বিধাতাকে ভুলিয়া যাই, তাঁহার বিধির প্রতিপগামী হই, তখন বিপদের কশাঘাতেই আমাদিগের চৈতন্যোদয় হয়। যখন মনকরী মোহমদে মত্ত হইয়া সুপথ কুপথ জ্ঞান হারায়, অথবা আপনাকেই অসাধারণ পরাক্রান্ত মনে করিয়া শক্তির অপব্যবহারে প্রস্তুত হয়, তখন দুঃখের অঙ্কুশাঘাতেই ঈশ্বর তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করেন এবং তাহার উপরেও যে আর একজন শক্তিমান্ নিয়ত বিরাজ করিতেছে, তাহার পরিচয় প্রদান করেন। সে অবনতজানু হইয়া পালকের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে ও তাঁহার চরণে প্রণত হয়। বিপদের অনলে দগ্ধ না হইলে সাধুতার দীপ্তি সম্যক্ প্রভাসিত হয় না এবং তাহার যথার্থ পরিচয়ও হয় না। সাধু-লোক দুঃখবিপত্তির মর্ম্মান্তিক রোদনধ্বনির অভ্যন্তরে এই সুস্পষ্ট বিধিবাণী শ্রবণ করত আশ্বস্ত হন যে, পৃথিবীই মানবের সর্ব্বস্ব নহে; পার্থিব সুখসম্পদ্ই তাঁহার চরম লক্ষ্যস্থানীয় নহে। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর এক জগতের জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। সেই গরীয়ান্ জগতের শাশ্বত সম্পদ্ই তাহার প্রধান লক্ষ্য; এবং তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্থিরতর অবলম্বনভূমি।

বিপদ্ দুঃখের জনক এবং উহা প্রীতির পরীক্ষক ও পরিপোষক। সংসারের কাল্পনিক বেশভূষা দেখিয়া আমরা অনেক সময়ে মোহিত হই। বিপদ্ ইহার প্রকৃত মূর্ত্তি আমাদিগের নিকট প্রকটিত করে। পৃথিবীতে স্বর্গ এবং নরক উভয়েরই প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ইহা এক

পক্ষে মনোহর নন্দনকানন, অপরপক্ষে শ্বাপদসঙ্কুল ঘোর অরণ্য। ইহা যেমন দেবতাদিগের নিবাসভূমি, তেমনই প্রাণহন্তারক মায়াবীর রাজ্য। এখানে সুহৃদের সংখ্যা অসীম বটে, কিন্তু শত্রুর সংখ্যাও অপরিমেয়। এখানে যাহারা বন্ধুতার ভাণ করিয়া স্বীয় কূট অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসে, তাহাদের ন্যায় মারাত্মক শত্রু আর কেহই নহে। তাহারা আমাদের স্বভাব ও অবস্থার রুগ্ন স্থানগুলি লক্ষ্য করে এবং কোথায় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে আমরা সহজে আয়ত্ত হইব, নিবিষ্টচিত্তে অনুধ্যান করিতে থাকে। এহেন বন্ধুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই সুকৃতির ফল। কিন্তু গুরুতর বিপৎ-পাতে তাহাদের অধিকাংশই পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। এইরূপে বিপদ্ আপনার কষ্টিপ্রস্তরে প্রীতির পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যকে চক্ষুষ্মান্ করে।

উহা কেবল প্রীতির পরীক্ষক নহে, পরিপোষকও বটে, জীবনমরুতে প্রীতির জলসেক ব্যতীত পথিক বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সংসারের ঘটনাচক্রে সময়ে সময়ে মনুষ্য এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, অনেক আত্মীয় বন্ধুর উপর বীতরাগ হইয়া, অথবা স্বয়ং অপরের অপ্রীতির কারণ হইয়া জীবন ভারবহ করিয়া ফেলে। এ অবস্থায় দুঃখ-বিপত্তির যত্নে নিদ্রিত প্রেম জাগরিত হয়। যখন গৃহবহিষ্কৃত অমিতাচারী পুত্রের দুঃখবিপত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া পিতা আর স্থির থাকিতে সমর্থ না হইয়া গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করত স্নেহবারিধারায় তাহার হৃদয় জ্বালা নির্ব্বাপিত করেন; যখন পুত্রকন্যার গলিত দেহযষ্টি জননী ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোগীর যন্ত্রণা হইতে অধিক যাতনা ভোগ করত অশ্রুপ্রবাহে তাহা ধৌত করেন; ভ্রাতার রুগ্ন শয্যায় বসিয়া ভগিনী যখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত আকুলপ্রাণে কেবলই তাহার সুখস্বাস্থ্য অনুসন্ধান করেন; স্বামী অথবা পত্নী একের যন্ত্রণা বিদূরিত

করিতে যখন অপরে আপনার হৃৎপিণ্ড অবাধে ছেদন করিয়া দিতে ব্যগ্র হন; বন্ধুর দুঃখ দূর করিবার জন্য যখন বন্ধু আবশ্যক হইলে আত্মোৎসর্গ করিতেও কাতর হন না, তখন ইহাদের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্যের কারণ থাকিলেও এমন পাষণ্ড কে আছে যে, তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে ?

সর্ব্বোপরি দুঃখবিপত্তি আমাদিগের শক্তির পরিচালক ও শক্তি-সঞ্চয়ের অমোঘ ঔষধ। উন্নতির পথ কুসুমবিকীর্ণ নহে। পৃথিবীতে সকলেই বড় লোক হয় না। সকল পদার্থই কার্য্যকর হয় না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে প্রতিনিয়ত অসার বস্তু ক্ষয়িত ও সারবান্ বস্তুর উৎকর্ষ হইতেছে। প্রকৃতি আপনার সুনিপুণ হস্তে প্রতিনিয়ত তণ্ডুল হইতে অকর্ম্মণ্য তুষগুলি পরিত্যাগ করিতেছেন। যাহারা বিপদের শূর্পবায়ু-তাড়নে অসারবৎ উড্ডীন না হইয়া সারবান্ বস্তুর ন্যায় তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে; পৃথিবীর পণ্যশালায় তাহাদের বিলক্ষণ ভরসা আছে।

যাহারা দুঃখবিপত্তির আক্রমণ ক্রমে সহ্য করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, কোন বিশেষ গুণের আস্পদ হইলেও তাহারা বিপদের সহসা আক্রমণে নিতান্ত বিধ্বস্ত হয়। জীবনে যে সকল আয়োজন ও উপকরণ থাকিলে উহা সারবান্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত না হইলে যেমন তৎসমুদয়ের সম্যক্ পরিচয় হয় না, তেমনই উহার প্রতিভা ও উপযোগিতাও বর্দ্ধিত হয় না। যদি কেহ সুখের দোলায় উপবেশন করিয়া হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইয়া থাকেন, তবে তিনি ভাগ্যবান্ হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যজীবনের প্রকৃত গৌরব তাহার ভোগ্য নহে। যিনি বিপদের সহিত সম্মুখসমরে জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার জীবনই গৌরবাস্পদ ; এবং তিনিই ঈশ্বরের কৃতী সন্তান। কিন্তু

যাহারা বিজয়ের আকাঙ্ক্ষী তাহাদের পক্ষে বলসঞ্চয় সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

যাহারা দুঃখবিপত্তির আঘাত ও আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ তাহারাই যথার্থ শক্তিমান্। সহিষ্ণুতাই শক্তিসঞ্চয়ের দৃঢ় দুর্গ এবং শক্তিই সফলতার জননী। অসহিষ্ণু শুষ্ক তৃণের ন্যায় ফুৎকারমাত্রে উড়িয়া যায়, কিন্তু সহিষ্ণু ব্যক্তি পর্ব্বতের ন্যায় অটল। কত মহাঝড় তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, কত ভূমিকম্প তাহাকে বিচলিত করিতে প্রয়াস পায়, কত কঠোর জ্বালা সে আপনার জঠরে জীর্ণ করে। ঐ সকল দৈবশক্তিকেও তৃণজ্ঞান করিয়া পর্ব্বত পৃথিবীর মেরুদণ্ডরূপে অবস্থান করে; এবং শব্দশাস্ত্রে 'ভূধর' অভিধান প্রাপ্ত হয়। যাহারা অসহিষ্ণু—দুঃখবিপত্তির ছায়া দেখিয়াই কম্পিত হয়—তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না; তাহাদিগের প্রাত নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইও না। তাহারা সমাজের ভারবহন জন্য সৃষ্ট হয় নাই; শুষ্কতৃণের ন্যায় বাত-হিল্লোলে ক্রীড়া করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম। সহিষ্ণু ব্যক্তিই সমাজের ধুরন্ধর; তিনি সিদ্ধিকে মস্তকে রাখিয়া পর্ব্বতের ন্যায় পৃথিবীর মেরুদণ্ডরূপে বিরাজ করিতে পারেন।

ঈশ্বর কষ্টের পর কষ্টতরে, বিপদের পর ঘোর বিপদে নিক্ষেপ করিয়া অনেক সময়ে মানবসন্তানের পরীক্ষা ও বলবিধান করেন সত্য, কিন্তু লঘুচেতা অসহিষ্ণু এক বিপদের পদচিহ্ন দেখিয়া স্বতঃই শত বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করে। বিপদ্ একা উপস্থিত হয় না,—একথা যাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা বিপদে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় অসহিষ্ণু ব্যক্তির অবস্থাই চিত্রিত করিয়াছেন। নতুবা বিপদের এমন কি শক্তি আছে যে, সে দলবল সমভিব্যাবহারে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে? বীর-পদাঘাতে যাহারা বিপদ্‌কে দলন করিতে সমর্থ, অথবা তাহার সহিত

সম্মুখসমরে নির্ভীক, তাহাদের নিকট কিন্তু বিপদ্ বড়ই হীনশক্তি। কিন্তু বিপদের ভ্রূকুটি দেখিয়াই যাহারা ভয়ে মনোবল বিসর্জ্জন দেয়, বিপদ্ প্রকৃতপক্ষেই তাহাদিগকে ব্যাঘ্রপরাক্রমে আয়ত্ত করিয়া বসে; এবং অনবরত এক অঙ্গের পর অপর অঙ্গ দংশন করিতে থাকে।

প্রকৃতির মহাগ্রন্থে ঈশ্বরের বিধি সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। বাহ্যজগতে যেরূপ, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। ঝড়ে বৃক্ষ দৃঢ় করে, বিপদ্ মানুষকে সবল করে। সুতীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মি উদ্ভিদের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়া তাহাকে সবল করে, যন্ত্রণার মুর্ম্মুরদহনে মানবের মনোবল এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। সৃষ্টিকার্য্য কি বিচিত্র প্রহেলিকাময়! যাহা একের বিনাশক, তাহাই অপরের পরিপোষক! যে ঝঞ্ঝাবায়ুতে অসার উদ্ভিদ্ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়, ক্ষয়িতমূল তরু উৎপাটিত হয়, তাহাতেই নবীন তরুলতার বল বর্দ্ধিত হয়। যে তীক্ষ্ণ কিরণে কোমলপ্রাণ উদ্ভিদ্ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাতেই অপরের তেজ বর্দ্ধিত হয়। পৃথিবীতে মানবসন্তানকে বাধা-বিপত্তি ও আপদ্ বিপদের সহিত নিত্য সহবাস করিতে হইবে, ইহা জানিয়াই ভগবান্ দুঃখের পর দুঃখে, বিপদের পর বিপদে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বলশালী করেন।

উদ্ভিদ্-জগতে উন্নতির যে সঙ্কেত লক্ষিত হয়, যদি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলা যায়, তবেই উন্নতি এবং শক্তি উভয়ই অধিকৃত হইতে পারে। যদি আমরা দুঃখের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য না করি, অপরিহার্য্য যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ রবিকর মস্তকের উপর গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত না হই, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি সুদূরপরাহত; সংসারকাননে তিষ্ঠিয়া থাকা অসম্ভব হইবে। তরুরাজি মলয়বায়ুতে সুশীতল হয়, শিশির বারিতে অভিষিক্ত হয়, পাখীর কাকলী ভ্রমরের গুঞ্জনে নিত্য উপাসিত হয়। প্রকৃতি কঠোর হইতে কঠোরতর অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া অগ্রে তাহাকে পরীক্ষা করেন,

তৎপর বিবিধ সুখের সামগ্রী উপহার দেন। তাহারাও ফল-প্রসূনদানে প্রকৃতিকে প্রত্যুপহার প্রদান করিয়া ধন্য হয়। মনুষ্যের জন্যও সুখের এবং শান্তির সহস্রদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে; কিন্তু বিনা পরীক্ষায় পুরস্কার-প্রত্যাশা ধৃষ্টতামাত্র। তাহাদিগকেও দুঃখবিপত্তির মহাপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া প্রকৃতিদত্ত অক্ষয় পুরস্কার লাভ করিতে হইবে; এবং প্রকৃতির বিধাতা যে উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সংসার-কাননে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা সংসিদ্ধ করিয়া আপনাদের জীবন ধন্য করিতে হইবে।

মন্ত্রের সাধন।

(ব্যোমযান।)

[সার জগদীশচন্দ্র বসু।]

(জগদীশচন্দ্রের জন্মস্থান—ঢাকা—বিক্রমপুর। পিতার নাম ৺ভগবানচন্দ্র বসু। পুত্র উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার নিকট হইতে উদ্যম, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি বড় হইবার বিশিষ্ট উপকরণগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুঃখ ছিল যে, যাঁহার বাণী শুনিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলী উদ্‌গ্রীব ও আকুল। তিনি আমাদের ত কিছু বলিয়া গেলেন না! সে দুঃখের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইয়াছে।—(কিন্তু আশা বড় বাড়িয়াছে) জগদীশচন্দ্র সুললিত ভাষায় 'অব্যক্ত' ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রায় প্রতি পত্রে ভক্তির রমণীয় উৎস উৎসারিত। পাঠে মনে হয়, জগদীশে ভক্তিই জগদীশচন্দ্রকে এত বড় বৈজ্ঞানিক করিয়াছে। মনে হয়—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" উপনিষদের এই অমর বাণী তাঁহার হৃদয় অমৃতময় করিয়াছে; ইহার ফলে তিনি যন্ত্রযোগে বিজ্ঞানমুখে এই মহাবাণীর সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। 'অব্যক্তের' ভাষা—কবির ভাষা, ললিত, মধুর, প্রাণস্পর্শী। ইহার প্রতি বাক্যে প্রীতির ধারা প্রবাহিত।]

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের পঞ্জরে নির্ম্মিত। বহু সহস্র বৎসরে অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহদ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছ।

আজকাল বিজ্ঞানদ্বারা যে সব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্ব্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্ত্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে, প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোন নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবালদ্বীপ যেরূপ একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা বলিতেছি।

একশত বৎসর পূর্ব্বে ইতালি দেশে গ্যালভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙ্‌কে স্পর্শ করিলে ব্যাঙ্‌ নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া, এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে উপহাস

করিত। তাঁহার নাম হইল, ব্যাঙ্-নাচান' অধ্যাপক। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, মরা ব্যাঙ্ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি ?”

কি লাভ ? সেই যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই এক শত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস যেন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ী চলিতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের-কোণে আসিয়াছে,—দূর আর দূর নাই। আমাদের স্বর বাড়ীর একদিক্ হইতে অন্য দিকে পৌঁছিত না। এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছি। এমন কি, এই শক্তির সাহায্যে দূর দেশে কি হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোন বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্য্যন্ত পৃথিবী এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহুদিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস বাহির হইয়া যায়, এ জন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেশমের আবরণ হইতে গ্যাস বাহির হইয়া যায় বলিয়া বেলুন আকাশে থাকিতে পারে না। সোয়ার্জ্জ নামে একজন জর্ম্মাণ এইজন্য আলুমিনিয়াম ধাতুর এক বেলুন প্রস্তুত করেন। আলুমিনিয়াম কাগজের ন্যায় হাল্‌কা অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতুনির্ম্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ্জ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বহু বৎসর নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্ম্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে, এ জন্য একটি ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে যেমন জলের নীচে স্ক্রু থাকে, এঞ্জিনের স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি বড় স্ক্রু নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্ম্মিত হওয়ার অল্প পরেই সোয়ার্জ্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। যাহার জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন পণ করিয়াছিলেন, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, এত দিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল।

সোয়ার্জ্জের সহধর্ম্মিণী তখন জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জর্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জ্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে, কেহ তাহা বিশ্বাস করিত না। কেবল বিধবার দুঃখকাহিনী শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধবিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহু লোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুনির্ম্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তার পর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিষ কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে! পরীক্ষকেরা একে অন্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত কল কোন দিনই পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটা মরিয়া গিয়াছে; আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে আসিয়াছে, সুতরাং নামমাত্র অন্ততঃ পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে বেলুনের সহিত কতকগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে ওগুলি কাটিয়া বেলুনটিকে পাতলা করিলে হয়ত

২।৪ হাত উঠিতে পারিবে। হায়! তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহই ছিল না। বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেলেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না! যে সকল কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল, তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ সব কল দ্বারা বেলুনকে ইচ্ছানুক্রমে দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আর এক বাধা পড়িল। সোয়ার্জ্জের অবর্ত্তমানে বেলুন কে চালাইবে? অপরে কি করিয়া কলের ব্যবহার বুঝিবে? সে যাহা হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন এঞ্জিনিয়ার সাধ্যমত কল চালাইতে সম্মত হইলেন। অদূরে বিধবা কলের প্রত্যেক স্পন্দন গণিতেছিলেন। বেলুন পৃথিবী হইতে উঠিতে পারিবে কি? মৃতব্যক্তির আশা ভরসা এইবারে হয় পূর্ণ হইবে নচেৎ একেবারে নির্ম্মূল হইবে। কল চালান হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এত দিনে সোয়ার্জ্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকেরা যে সব কল অনাবশ্যক মনে করিয়াছিল, স্বল্প কালের মধ্যেই তাহার আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সামলাইবার কল না থাকাতে অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এই দুর্দ্দশাতে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সোয়ার্জ্জ যে অভি-প্রায়ে বেলুন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিন হয়ত সফল হইবে। দশবৎসরের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। জেপেলিন যে ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্র হইয়াছিল। যুদ্ধের পর এই ব্যোমযান আটলাণ্টিক মহাসাগর অনায়াসে পার হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

ব্যোমযান গ্যাস ভরিয়া লঘু করিতে হয়, সুতরাং আকারে অতি বৃহৎ, এবং নির্ম্মাণ করিতে বহু ব্যয়সাপেক্ষ। পাখীরা কি সহজেই উড়িয়া বেড়ায়! মানুষ কি কখন পাখীর মত উড়িতে পারিবে? বড় বড় পাখীগুলি কেমন দুই চারিবার পাখা নাড়িয়া শূন্যে উঠে, তাহার পর পাখা বিস্তার করিয়া চক্রাকারে আকাশে ঘুরিতে থাকে। ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে মিলিয়া যায়।

তোমাদের কি কখনও পাখীর মত উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই? জার্ম্মাণি দেশে লিলিয়েনথাল মনে করিলেন, আমরা পাখীর মত আকাশভ্রমণ করিতে পারিব না? তাহার পর পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিদ্যা সাধন করিতে অনেক দিন লাগিবে। শিশু যেরূপ একটু একটু করিয়া অনেক চেষ্টায় হাঁটিতে শিখে, তাঁহাকেও সেইরূপ করিয়া উড়িতে শিখিতে হইবে। কিন্তু শিশু যেরূপ পড়িয়া গেলে আবার উঠিতে চেষ্টা করে, আকাশ হইতে পড়িয়া গেলে আর ত উঠিবার সাধ্য থাকিবে না, মৃত্যু নিশ্চয়। এত বিপদ্ জানিয়াও তিনি পরীক্ষা করিতে বিরত হইলেন না। অনেক পরীক্ষার পর নানা প্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া, পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল যে, দুইখানা পাখার পরিবর্ত্তে যদি অধিকসংখ্যক পাখা ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উড়িবার বেশী সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, তাহাই ঠিক।

ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এই সব পরীক্ষা করিতেছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার কার্য্য শেষ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এখন যে কল প্রস্তুত করিলেন, তাড়াতাড়িতে তাহা পূর্ব্বের মত দৃঢ় হইল না। তিনি সেই

অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উড়িতে চেষ্টা করিলেন। এবার অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা আসিয়া উপরের একখানা পাখা ভাঙ্গিয়া দিল। এই দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি যে সব পরীক্ষার দ্বারা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল। তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরে উড়িবার কল নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে। মার্কিন দেশে অধ্যাপক ল্যাঙ্গলি পাখা সংযুক্ত উড়িবার কল প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে অতি হাল্কা একখানা এঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। পরীক্ষার দিন অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মকারের শৈথিল্যবশতঃ একটি স্ক্রু ঢিলা হইয়াছিল। এঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় ঢিলা স্ক্রুটি খুলিয়া গেল, এবং কলটি নদীগর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙ্গলি ভগ্ন-হৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা ভীরু তাঁহারাই বহু ব্যর্থ সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। বীর পুরুষেরাই নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন। ল্যাঙ্গলির মৃত্যুর পর তাঁহারই স্বদেশী উইলবার রাইট উড়িবার কল লইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করেন। উড়িবার সময় একবার কল থামিয়া যায় এবং আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানি পা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

গাছের কথা।

[সার জগদীশচন্দ্র বসু।]

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনও দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার ফুটিয়া যে দুই চারিটি কথা বলে, তাহাও এমন আধ আধ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না; চক্ষু মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা কয়, আমরা তাহা বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ী হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়ীতে বসিল; বসিয়া, গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়, খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। পায়রায় কি-রকমভাবে ডাকে? বলিলেই ডাকিয়া দেখায়; তদ্ভিন্ন সুখে দুঃখে, চলিতে বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই।

এক দিন বাড়ী আসিয়া দেখি, খোকার বড় জ্বর হইয়াছে; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ী অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও

চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল, এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিক ক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে "খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড় ভালবাসে।" আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোন কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই খোকাকে ভালবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন, ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ, দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি খালি লাগিত। তারপর গাছ, পাখী, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি। এই যে গাছগুলি কোন কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মত আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এ সব কিছুই জানিতাম না, এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মত অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই, জীবন ধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যের সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তার পর মানুষের সর্ব্বোচ্চ গুণ স্বার্থত্যাগ—

গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবনদান উদ্ভিদে সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়া মাত্র।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর কোন গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময়ে এই ডালে কত পাতা ছিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বলত—এই গাছ আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে আর মরা ডালটা ক্ষয় পাইতেছে; একে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়, জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখীর ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটির উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু।

[সার জগদীশচন্দ্র বসু।]

মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তার পর বর্ষার আরম্ভে দুই এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্য্যের আলো দেখিবে।" আস্তে আস্তে বীজের ঢাক্‌নাটি খসিয়া পড়িল। দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয়, শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্য্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহার নাম মূল। আর এক অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে, তাহাকে বলে—কাণ্ড। সকল গাছেই "মূল" আর "কাণ্ড" এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্য্যের কথা, গাছকে যেরূপেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল। দুই এক দিন পরে দেখিতে পাইলাম

যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উপরের দিকে উঠিল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেল।

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিষ খাইতে পারি। ছোট ছোট শিশুদের দাঁত নাই, তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিষ গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিষ আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায় ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এই সব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোট মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এই সব মুখে ছোট ছোট ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না, তখন ঠোঁট দুটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাস করি, তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়;—তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে, তবে সকল জন্তু অল্প দিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ; যাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়।

গাছের পাতার উপর যখন সূর্য্যের আলোক পড়ে, তখন পাতাগুলি সূর্য্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্ব্ব প্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো পায়। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ, তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক্ ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া,কে আগে আলোক পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে, এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্য্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্য্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাহা সূর্য্যের তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে; গাছে যে সূর্য্যের তেজ আছে, তাহা এই প্রকারে জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমারাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরাও আলো আহার করিয়াই বাঁচিয়া আছি।

কোনও কোনও গাছ এক বৎসরের পরেই মরিয়া যায়। সব গাছই মরিবার পূর্ব্বে সন্তান রাখিয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলিই গাছের সন্তান। বীজ রক্ষা করিবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়া গাছ একটি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করে। গাছ যখন ফুলে ঢাকিয়া থাকে, তখন কেমন সুন্দর দেখায়। মনে হয় গাছ যেন হাসিতেছে। ফুলের ন্যায়

সুন্দর জিনিষ আর কি আছে ? গাছ ও মাটি হইতে আহার লয়, আর বাতাস হইতে অঙ্গার আহার করে। এই সামান্য জিনিষ দিয়া কি করিয়া এরূপ সুন্দর ফুল হইল ? গল্পে শুনিয়াছি স্পর্শমণি নামে এক প্রকার মণি আছে, তাহা ছোয়াইলে লোহা সোনা হইয়া যায়। আমার মনে হয়, মাতার স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালবাসাটাই যেন ফুলে ফুটিয়াছে। ভালবাসার স্পর্শেই মাটি ও অঙ্গার ফুল হইয়া গিয়াছে।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়! বোধ হয় গাছেরও যেন কত আনন্দ! আনন্দের দিনে আমরা দশ জনকে নিমন্ত্রণ করি, ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধু বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে "কোথায় আমার বন্ধু-বান্ধব, আজ আমার বাড়ীতে এস। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ী যদি চিনিতে না পার, সে জন্য নানা রঙ্গের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙ্গীন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।" মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকালই বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিতে আইসে। কোন কোন পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখীর ভয়ে বাহির হইতে পারে না; পাখী তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল, সন্ধ্যা হইলেই চারি দিকে সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছ, ফুলের মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলের রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছি এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ, বীজগুলিকে লালন পালন করিয়া থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছু দিন পূর্ব্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত; পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত; ছোট ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক একটি ঝাপটা লাগিলে গাছটি থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন গোড়া ভাঙ্গিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়। এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

সম্পূর্ণ

টীকা।

আলেখ্য দর্শন।—

সমস্তক—অস্ত্রের প্রয়োগ সংহারের মন্ত্র সহ। **জৃম্ভক**—নিদ্রাকারক। **মিথিলা**—মিথিপ্রতিষ্ঠিত নগর, বর্ত্তমান ত্রিহুত। **শতানন্দ**—জনকের পুরোহিত। **শৃঙ্গবের নগর**—গুহকের রাজধানী, কেহ কেহ বলেন ইহার বর্ত্তমান নাম শৃঙ্গোর, প্রয়াগের ২২ মাইল দূরে বায়ু কোণে অবস্থিত। **তাপসতরু**—ইঙ্গুদীবৃক্ষ। **কালিন্দী**—যমুনানদী (কলিন্দ—হিমালয়ের অংশবিশেষ—হইতে উৎপন্ন। **জনস্থান**—দণ্ডকারণ্যের সন্নিহিত স্থানবিশেষ। **প্রস্রবণ-গিরি**—প্রস্রবণপ্রধান গিরি, এখানে মাল্যবান্ পর্ব্বত। **পঞ্চবটী**—দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ, বর্ত্তমান নাম নাসিক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। **পঞ্চবট** ঃ—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী, অশোক। **ঋষ্যমূক**—পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত। **সিদ্ধ শবরী শ্রমণা**—তপঃসিদ্ধা ব্যাধজাতীয়া তপস্বিনী।

চন্দ্রাপীড়ের প্রতি।—

বিষয়তৃষ্ণা—রূপাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি তীব্র লালসা।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।—

অশ্বিনীকুমারদ্বয়—সূর্য্যের সহিত বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞানাম্নী কন্যার বিবাহ হয়। পরে ঘটনাবশতঃ উভয়ে অশ্ব ও অশ্বিনী মূর্ত্তি ধারণ করেন। ইহাঁদের দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত। ইহাঁরা চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া স্বর্গে চিকিৎসা করায় স্বর্গবৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। চিকিৎসাসারতন্ত্র গ্রন্থ ইহাঁদের রচিত। ইহাঁরাই মাদ্রীসুত নকুল সহদেবের জনক।

দ্বৈতবন—সরস্বতীতীরস্থ শোক মোহ রহিত বনবিশেষ।

মরুদ্গণ—দিতির পুত্রগণ দেবগণকর্তৃক নিহত হইলে তিনি পতির নিকট অজেয় পুত্রের কামনা করেন। অতঃপর তাঁহার গর্ভে মরুতের জন্ম হইলে গর্ভাবস্থায় ইন্দ্র বজ্রাঘাতে ইহাঁকে ঊনপঞ্চাশৎ অংশে বিভক্ত করেন। কশ্যপের বরে জীবন পাইয়া ইনি ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু নামে খ্যাত ও পবন দেবের অধীন হন।

ক্রীটদ্বীপ।—

ক্রীট ও সাইপ্রস—ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত দুইটি দ্বীপ।

মাণিকলাল।—

রূপনগরের রাজা বিক্রমশোলাঙ্কীর কন্যা চঞ্চলকুমারী একদা এক তস্‌বিরওয়ালী অর্থাৎ চিত্রবিক্রেত্রীর নিকট হইতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক খানি ছবি ক্রয় করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করেন। তস্‌বির ওয়ালী দরিয়ানাম্নী এক পরিচারিকা দ্বারা এই সংবাদ বাদসাহের প্রধানা বেগম উদিপুরীর কর্ণগোচর করায় বাদসাহ আওরঙ্গজেব উদিপুরীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আনাইয়া তাঁহা দ্বারা বেগমের তামাকু সাজাইয়া দিবেন। অতঃপর সম্রাট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া চঞ্চলকুমারীকে আনয়ন জন্য বিক্রমশোলাঙ্কীর নিকট মবারক নামক এক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। এ দিকে বাদসাহের অন্যতমা হিন্দু মহিষী যোধপুরী বেগম বাদসাহের আন্তরিক অভিপ্রায় জানাইয়া চঞ্চল কুমারীকে দিল্লীতে আসিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার নিকট এক দূতী প্রেরণ করেন। বিক্রমশোলাঙ্কী একজন সামন্ত রাজা মাত্র। সম্রাটের আদেশের অন্যথাচরণ তাঁহার সাধ্যাতীত। চঞ্চলকুমারী সখী নির্ম্মলার সহিত পরামর্শ করিয়া মেবারের রাণা রাজসিংহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া এক পত্র ও রাখী পাঠাইয়া দিলেন। কুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্র এই পত্রাদি লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে তিনি দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দস্যুরা তাঁহার

নিকট হইতে পত্রাদি কাড়িয়া লইল। ঘটনাক্রমে রাজসিংহ সেই বনে মৃগয়ার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি দস্যুদিগকে হত ও পরাজিত করিয়া সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া উহার মর্ম্ম অবগত হইলেন।

পথিপার্শ্বে।—

ঘুটিঙ্—এই শব্দ সংস্কৃত ঘর্ণণাল (নুড়ি) শব্দ হইতে আসিয়াছে।

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গি করিল হরমণি অপ্রস্তুত হইল—অর্থাৎ প্রশ্ন করিতেছ কেন? তুমি স্ত্রীলোক হইয়াও কি বুঝিতে পারিতেছ না, যে, আমি সধবা কি বিধবা? সধবা স্ত্রীরা শাঁখা সিন্দুর যে কোন চিহ্ন দ্বারা সর্ব্বদা সধবা লক্ষণ রক্ষা করেন। হরমণি তাহা লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া অপ্রস্তুত হইলেন।

রঘুনাথজী হাবিলদার।—

কঙ্কণ প্রদেশ—গোয়া হইতে খান্দেশ পর্য্যন্ত এবং সহ্যাদ্রি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। এক্ষণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত।

কিল্লাদার—(আরবি, কালা, কিলা—দুর্গ গড়) দুর্গাধিপতি।

শিবাজী—মারাঠা রাজ্যের স্থাপয়িতা। ইহাঁর পিতা—শাহজী, মাতা জিজাবাঈ। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে পুনার অনতিদূরে শিবাজীর জন্ম, ১৬৮০ খৃঃ অব্দে মৃত্যু। **হাবিলদার**—শিবাজীর অধীন সৈন্যাধ্যক্ষ-বিশেষ।

ভারতের অনার্য্যজাতি।—

পঞ্জাব—সিন্ধুনদের পাঁচটি উপনদির (শতদ্রু বিপাশা চন্দ্রভাগা ইরাবতী বিতস্তা) সঙ্গম স্থল বলিয়া এই নাম। **গারো**—আসামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গারো পর্ব্বত শ্রেণীর উপত্যকাবাসী অসভ্য জাতি। **কোল**—অনার্য্য জাতি; ছোটনাগপুর ও বীরভূম অঞ্চলে ইহাদের অধিকাংশের বাস। **ভীল**—মারবারের আদিম অধিবাসী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। রাজ-

পুতনায় আরাবল্লী শৈলমালা হইতে সিন্ধু ও রাজপুতনার মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এবং খান্দেশ ও আহম্মদাবাদের বন ও তুঙ্গশৃঙ্গে ভীলদিগের বাস। **খন্দ**—উড়িষ্যাবাসী অসভ্য জাতিবিশেষ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।—

পাশ্চাত্ত্য—পশ্চাৎ+ত্যণ, (ত্য নহে) পাশ্চাত্য অশুদ্ধ।

ক্লিফোর্ডের কীট।—

ইমানুয়েল ক্যাণ্ট—(Inmanuel Kant) (১৭২৪—১৮০৪) সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিক। **ইউক্লিড**—(Euclid) গ্রীসদেশীয় গণিতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি ইউরোপে প্রথম জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রচার করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।—

নচিকেতা—বাজশ্রবার পুত্র, ঋষিবিশেষ। **শঙ্কর**—শঙ্করাচার্য্য; কেরলদেশস্থ চিদম্বর গ্রামে ৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে জন্ম। কেদারনাথ তীর্থে ৩২ বৎসর বয়সে মৃত্যু। অসাধারণ প্রতিভাবান্ পুরুষ। ইহাঁর প্রণীত বেদান্তভাষ্য, গীতাভাষ্য, মোহমুদ্গর প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাস করিয়া এ দেশে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্ম্মের জয়।—

উপনিষৎ—ঈশ্বরপ্রতিপাদ্য শাস্ত্র। **সূত্রধরতনয়**—যীশুখ্রীষ্ট। **সীজর**—(Julius Cæsar) সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় মহাবীর। ১০০ খ্রীঃ পূর্ব্বে জন্ম, ৪৪ খ্রীঃ পূর্ব্বে মৃত্যু। **নেপোলিয়ন**—(Napolion Buonaparte) ফ্রান্সের সুবিখ্যাত সম্রাট। কর্সিকা দ্বীপে ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে জন্ম। ইংরাজের হস্তে বন্দিদশায় সেণ্টহেলেনা দ্বীপে ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু। **সিকন্দার**—(Alexander the Great) গ্রীসের মাসিডনিয়ার বিখ্যাত রাজা। খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬ অব্দে জন্ম। খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে বাবিলনে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

রামায়ণের কতিপয় চরিত্র।—

বাল্মীকি—চ্যবন মুনির পুত্র। পূর্ব্ব নাম রত্নাকর। ইনি যৌবনে দস্যু ছিলেন। পরে মহামুনি নারদের উপদেশে বিবেক লাভ করিয়া "কাব্য-রত্নাকর কবি" হইয়াছিলেন।

মারুতি—মরুৎ অর্থাৎ পবনের পুত্র—হনুমান্।

বিনয়ের অবতার।—

লালাবাবু—প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে ইহাঁর জন্ম। কথিত আছে শুষ্কতৃণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতের ন্যায় এক সামান্য মেছুনীর বাক্যে ইহাঁর ধর্ম্মজীবন উদ্দীপ্ত হয়।

মাধুকরী বৃত্তি—মধুকর যেমন পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিয়া মধু সংগ্রহ করে সেইরূপ দ্বারে দ্বারে গিয়া মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিয়া দৈনন্দিন আহার্য্য সংগ্রহ করা।

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র।—

আইন-ই-আকবরি—মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফাজেল এই গ্রন্থের প্রণেতা। **আইভানহো**—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্কট প্রণীত বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাসের আখ্যায়িকার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনীর" আখ্যানবস্তুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। **কৃষ্ণ বন্দ্যো।**—রেভারেণ্ড কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনিই এদেশে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। **হিন্দুপেট্রিয়ট**—৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ কীর্ত্তি। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাকী এই পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

রাজেন্দ্রলাল—(মিত্র)—কলিকাতার শুঁড়ায় ১৮১৯ খৃঃ অব্দে জন্ম। পিতা জনমেজয় মিত্র। ইনি ভূসম্পত্তির রাজা নয়, জ্ঞানসম্পত্তির

রাজা ছিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দ্দু, পার্শি ফ্রান্স, গ্রীক, লাটিন, জার্ম্মাণি প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর পাণ্ডিত্যে প্রতীচ্য পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি যেমন জ্ঞানী তেমনই নির্ভীক, তেমনই তেজস্বী ছিলেন। অসাধারণ গুণবত্তার জন্য ইনি ডি, এল; রায় বাহাদুর; সি, আই, ই এবং রাজা উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথমে এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদের গৌরব প্রাপ্ত হন।

প্যারীচরণ—(সরকার) কলিকাতা চোর বাগানে ১২৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপনায় প্রথম বাঙ্গালী অধ্যাপক। ইনি বাঙ্গালা "হিতসাধক" ও ইংরেজী 'ওয়েল উইসার' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। **প্যারীচাঁদ** (মিত্র) ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। ১২২১ সালে কলিকাতা নিমতলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া মাতৃপাদোদক পান না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। প্যারীচাঁদের লিখিত পুস্তকাবলীর মধ্যে "আলালের ঘরে দুলাল" "আধ্যাত্মিকা," "অভেদী" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—(রাজা, সার) ইনি হরকুমার ঠাকুরের পুত্র ও মহারাজ বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১২৪৭ সালে সৌরীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাঁর সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—হিন্দুসঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচার। এই কার্য্যে যে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন, যেরূপ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে ইহাঁর নাম শুধু ভারতে কেন সভ্য জগতে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান আছে ও থাকিবে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।– সুপণ্ডিত সুকবি ছিলেন। ইহাঁর প্রণীত "মিত্রাবিলাপ কাব্য" বিখ্যাত গ্রন্থ।

ভরত-মিলন।—

ভরদ্বাজ মুনি—বৃহস্পতির পুত্র। সুবিখ্যাত বীর কুরুকুল গুরু দ্রোণ ইহাঁরই পুত্র। **নন্দিগ্রাম**।—ভরতের মাতুলালয়; রামের বনবাসকালে তাঁহার পাদুকাযুগল সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ভরত এইস্থানে রাজত্ব করেন।

মধুসূদনের ক্যাব্যানুরাগ।—

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—কবি মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তিপ্রণীত সুবিখ্যাত চণ্ডী-মঙ্গল কাব্য। কবিকঙ্কণ রাজদত্ত উপাধি। কবিকঙ্কণ দুঃখের কবি হইলেও হাস্যরসের বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত।

হোমর—(Homer) গ্রীসের মহাকবি। জগদ্বিখ্যাত "ইলিয়াড" (Iliad) ও ওডেসী (Odyssey) ইহার লেখনীপ্রসূত।

ভার্জ্জিল—(vergil (রোমের মহাকবি। ৭০ খৃঃ অব্দে সিসল-পিলের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এনিড (Ænid) একলাগ (Eclogues) প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

দান্তে—(Alighiere Dante) (১২৬৫—১৩২১) ইতালীর মহাকবি। ইহাঁর রচিত ডিভাইন কমেডিয়া (Divina Commedia) প্রসিদ্ধ কাব্য।

কাশীরাম দাস কায়স্থ সংস্কৃতজ্ঞ কবি। অনুমান—খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। বর্দ্ধমানে সিঙ্গি গ্রামে ইহাঁর জন্ম। বাঙ্গালা পদ্য মহাভারত ইহাঁর অতুলনীয় কীর্ত্তি।

কৃত্তিবাস—অনুমান ১৫শ শতাব্দীতে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাস ওঝা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রণীত বাঙ্গালা পদ্য রামায়ণ এখনও এ দেশে অনেকে ধর্ম্মলাভাশায় নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন।

তুলসীদাস—এই ভক্ত কবি আকবরের রাজত্বকালে জীবিত

ছিলেন। ইঁহার রচিত হিন্দি রামায়ণ অতি শ্রুতিরসায়ন কাব্য। ইঁহার দোঁহাবলীও অপূর্ব্ব ও উপদেশপূর্ণ।

আগমনী—দুর্গার আগমনবিষয়িণী গীতি। **বিজয়া**—দুর্গার প্রত্যাগমনবিষয়িণী গীতি। **সখীসংবাদ**—রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ে রাধিকা ও বৃন্দাললিতা প্রভৃতি সখীগণের উক্তি প্রত্যুক্তি।

পিতৃভক্ত জালিম সিংহ।—

টিসিনসের যুদ্ধ—টিসিনস ইতালীর উত্তরাংশে অবস্থিত। খৃঃ পূর্ব্ব ২১৮ অব্দে কার্থেজীয় মহাবীর হানিবলের সহিত রোমীয় সেনাপতি সিপিওর যুদ্ধ হয়। সিপিও পরাজিত ও আহত হন। **হানিবল**—(Hannibal) খ্রীঃ পূর্ব্ব ২৪৭ অব্দে হানিবল কার্থেজে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর ন্যায় বীর পৃথিবীতে অল্পই জন্মিয়াছেন। **বালক সিপিও**—(Africanus Mazor Scipio) খ্রীঃ পূর্ব্ব ২৩৪ হইতে খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৮৩ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি জামার (Jama) যুদ্ধে হানিবলকে পরাজিত করেন। **এজহিলের যুদ্ধ**—ইংলণ্ডে 'এজ' পার্ব্বত্যপ্রদেশে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সৈন্যের সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের যুদ্ধ হয়। চার্লস পরাজিত হন। **ক্যাসাবিয়াঙ্কা**--(casabiarca) ফ্রান্সের বিখ্যাত পিতৃভক্ত বালক।

উইলবার ফোর্স।—(William Wilberforce) (১৭৫৯—১৮৩৩)

পার্লামেণ্ট—(Parliament) ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহাসভা।

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়—গণিতলোচনার জন্য বিখ্যাত।

মহর্ষি মনসূর।—

মহর্ষি মনসুর—ধর্ম্মের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এই মুসলমান সাধু 'আনাল হক' অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্ম' এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

সেখ্ সাদী—পারস্য-সিরাজবাসী। পারসিক বা আরবী ভাষায় এমন সুরসিক ও রসজ্ঞ কবি আর নাই। ১১৭৪ খৃীঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম, ১২০ বৎসর বয়সে মৃত্যু। ইহাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে গুলিস্তান ও বোস্তান প্রধান। **ইরাণ**—সম্ভবতঃ আধুনিক পারস্য। কেহ কেহ বলেন ইরাণই আর্য্যদিগের আদি নিবাস।

সুফী—অদ্বৈতবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। কাহারও কাহারও মতে গ্রীক 'Sofos' সফস শব্দ হইতে এবং অপরের মতে আরবী পশমবাচক সুফ্ শব্দ হইতে সুফী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত মতের কারণ দরবেশদিগের অনেকেই উলের পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সর্ব্বভূতে ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

অহঙ্কার।—

এক ঋষি—চার্ব্বাক। ইহাঁর মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, পরলোক নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।

১৫২ পৃঃ—**ধরিত্রী যেদিন মরকতচ্ছদে জীব-নিবাসের যোগ্য হইলেন।**—ঐতরেয়োপনিষদের মতে প্রথমে সৌর জগৎ, পরে উদ্ভিদ, পরে ইতর প্রাণী, পরে মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যকেরও এই মত।

পরিশ্রম ও প্রতিভা।—

নিউটন—(Sir Isac Newton) ইংলণ্ডে উল্‌থপ নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে জন্ম। এবং ৮৫ বৎসর বয়সে কেনিংটন নগরে মৃত্যু। গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহাঁর ন্যায় প্রতিভাশালী পণ্ডিত জগতে দুর্ল্লভ। ইনি জ্যোতিষ, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিবিধ তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

গার্ফিল্ড—(James Abram Garfield) (১৮৩১—১৮৮১) সামান্য অবস্থা হইতে স্বাবলম্বনবলে আমেরিকা-ইউনাইটেড ষ্টেট্সের প্রেসিডেণ্ট পদ লাভ করিয়াছিলেন। ডিমস্থিনিস—(Demosthenes) গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ বক্তা। (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৫—খৃঃ পূঃ ৬২২)। কোপারনিকস্ (Copernicus) প্রসিয়ায় ১৪৭৩ খৃীঃ অব্দে জন্ম, ১৫৪৩ খৃীঃ অব্দে মৃত্যু। হরিনাথ—হরিনাথ দে, পিতা—রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে, জন্মস্থান—২৪ পরগণা—এড়িয়াদহ।

মা।—

মেরী—(Mary) যীশু খ্রীষ্টের মাতা। রাফেল—(Raphael, (১৫৮৩—১৫২০) ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর। ভীষ্ম—দেবব্রত। ইনি পিতার পরিতোষের জন্য চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করেন। ইহাঁর ন্যায় মহাবীর জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ।

সাধারণের উন্নতি।—

মনু—মনু হইতে সভ্যসমাজের সৃষ্টি। ইনি স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ সংহিতাকার। কার্ণিস—ছাদের উপরে চতুর্দ্দিকে যে অল্পবিস্তৃত স্থান বাহির দিকে প্রস্তুত হয়। বাজারু—বাজারসম্বন্ধীয়, সস্তা।

মন্ত্রের সাধন।

গ্যালভানি—(Aloisia galvani) (১৭৩৭—১৭৯৪) জন্মস্থান—ইতালী। জেপেলিন—জার্ম্মাণির স্বনামখ্যাত বিশাল ব্যোমযানের আবিষ্কর্ত্তা।

ল্যাঙ্গলি—(Samuel Pierport Langley) ১৮৩৪ খৃীঃ অব্দে বোষ্টন নগরে জন্ম। আমেরিকার প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ।